আবরণে আভরণে ভারতীয় নারী

চিত্রা দেব

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় – তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

আবরণে-আভরণে ভারতীয় নারী

আবরণে আভরণে ভারতীয় নারী

চিত্রা দেব

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর—১৯৬১

প্রচ্ছদ শিল্পী
গণেশ বসু

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১২, যতীন্দ্র মোহন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৬

শ্রীমতী বীণা চক্রবর্তী
করকমলেষু

সুবেশা নারীর মিছিল   টেরাকোটা

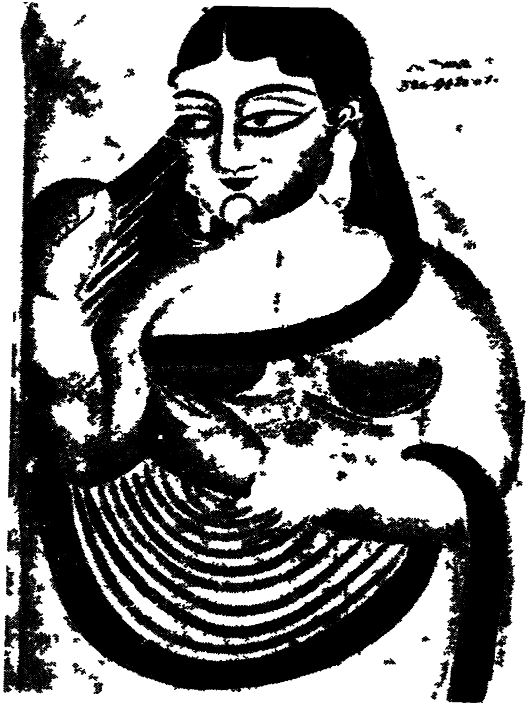

বঙ্গনারীর সাবেকী সাজ   কালীঘাটের পট

আধুনিকার সূচনা · ঠাকুরবাড়ির সাজ

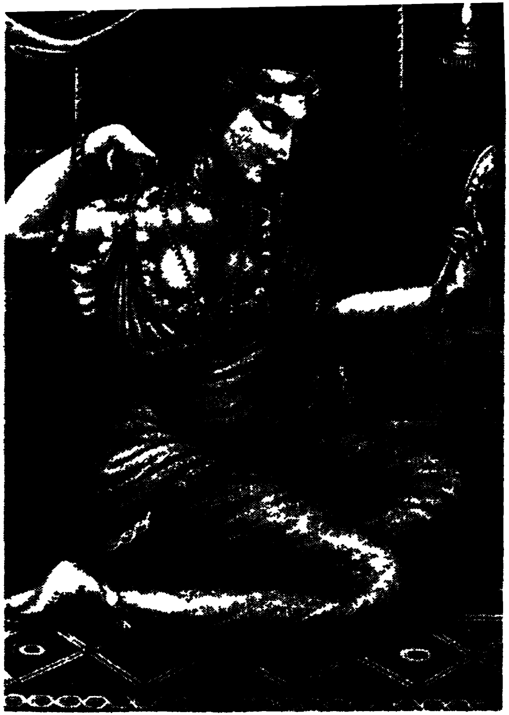

বিলাসিনীর প্রসাধন   চিৎপুরের লিথোগ্রাফ

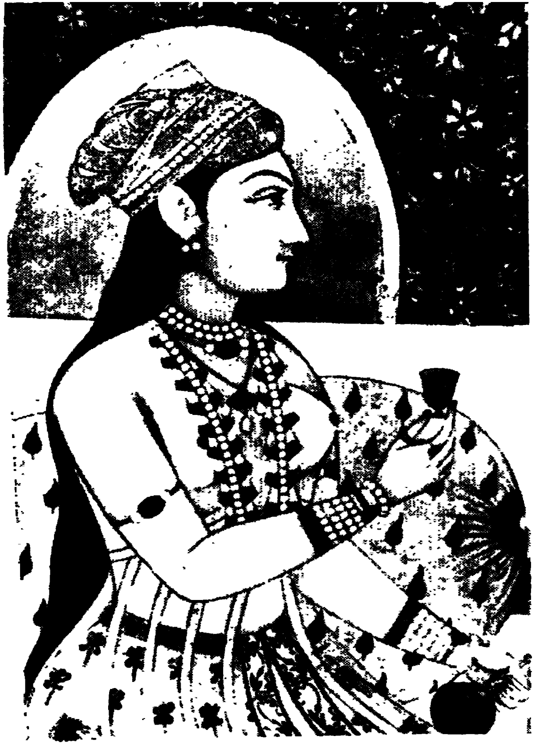

নূরজাহান পোশাকের জগতে বিপ্লব এনেছিলেন

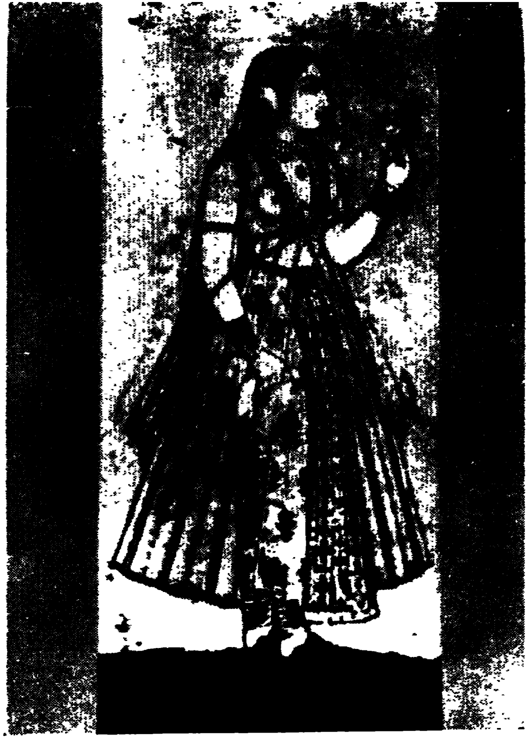

হারেমকন্যার সাজে মসলিন : মুঘল চিত্র

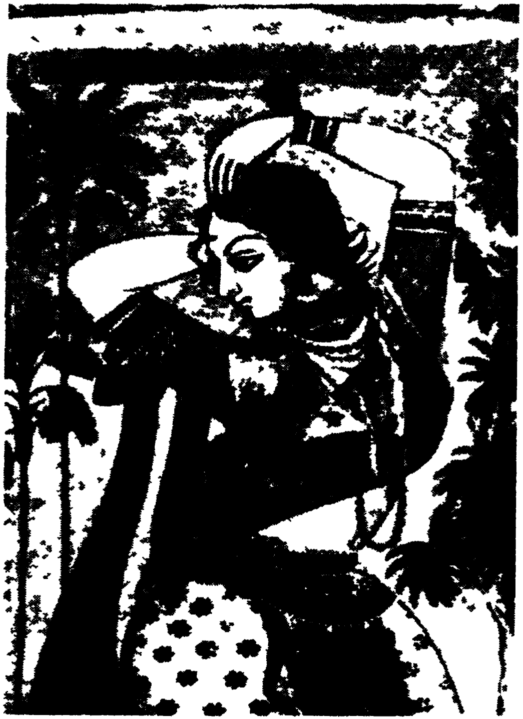

পোশাকে উত্তর ও দক্ষিণী রীতির মিশ্রণ   গোলকণ্ডা চিত্র

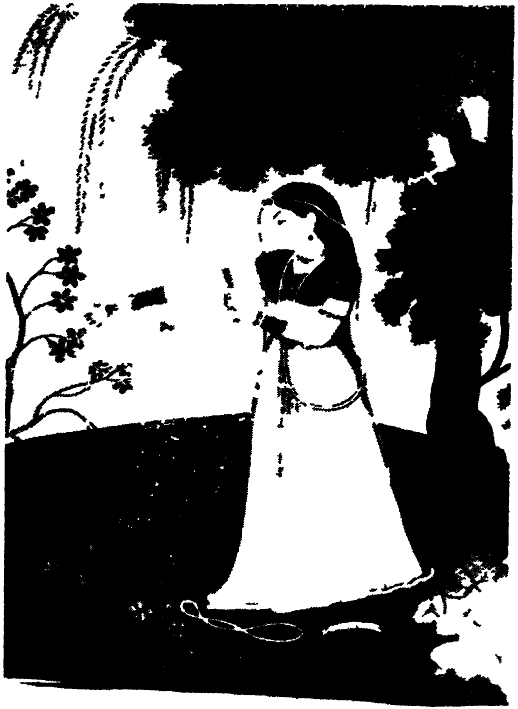

ওড়নায় শাড়ির পূর্বাভাস   কাংড়া চিত্র

অপ্সরার অঙ্গে অপরূপ অলঙ্কার যোধপুর

পার্বতীর দক্ষিণী সাজ · তাঞ্জোর

সুরসুন্দরীর সূক্ষ্মবস্ত্রে নকশা খাজুরাহো

মদনিকার প্রসাধন বেলুর

শালভঞ্জিকার অলঙ্কার সাঁচী

চামরধারিণী যক্ষীর সাজ বিতর্কের ঝড় তুলেছিল দিদারগঞ্জ

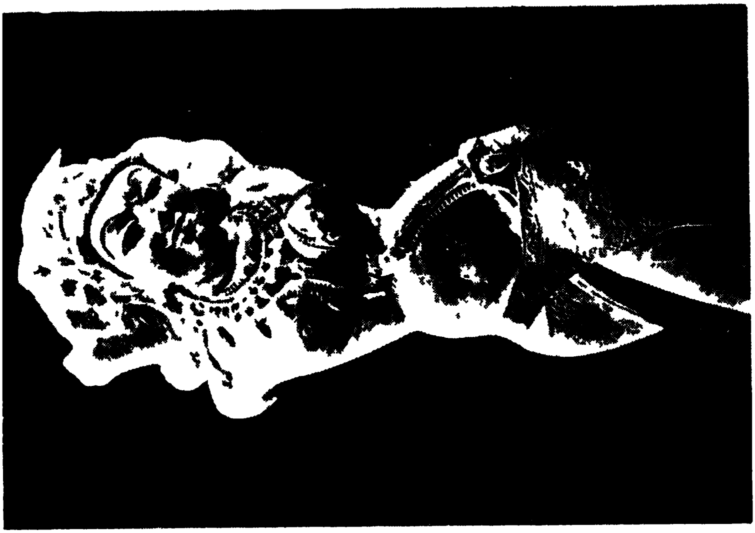

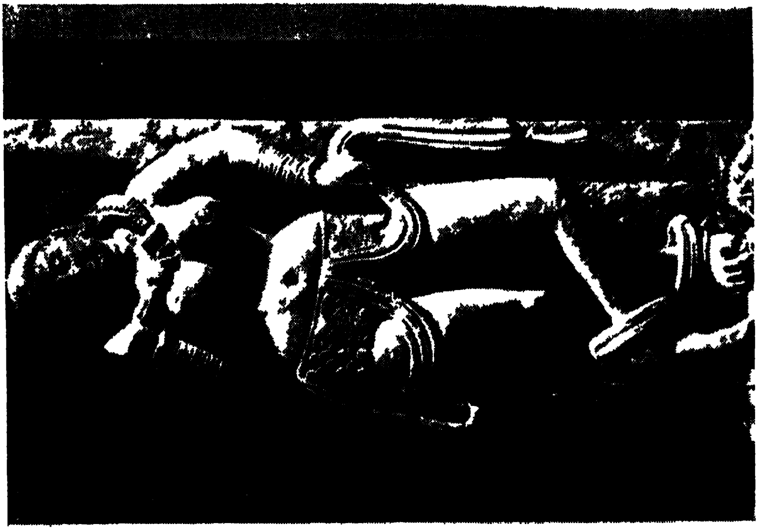

'সব নারীই সুন্দর', প্রখ্যাত ডিজাইনার ডিয়র এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'কেউ বেশি কেউ কম।' তাঁর মতে, 'সাজ-পোশাকের কাজ হল দেহের যা সুন্দর তাকে প্রকট করা। যে সৌন্দর্য থাকা উচিত ছিল তার আভাস দেওয়া, আর, যা দৃষ্টিনন্দন নয় তাকে চোখের আড়ালে রাখা।' ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নারীদের বহুবিচিত্র সাজসজ্জার দিকে তাকালে ডিয়র সাহেবের কথার যাথার্থ্য ধরা পড়ে। নতুন করে বুঝতে পারি, প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের নারীরা আপন আপন রূপরচনার ক্ষেত্রে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির অসামান্য নজির স্থাপন করে গিয়েছেন। কোন একটি বা দুটি ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই। যখন যে সাজটি তাঁদের ভাল লেগেছে তখনই তাঁরা সেটিকে গ্রহণ করেছেন নিজেদের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করবার জন্যে। বিদেশে রূপসীর অনাবৃত বরতনু যতই আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন ভারতীয় সংস্কৃতি সুসজ্জিতা নারীকেই সুন্দরীর মর্যাদা দিয়েছে।

মানুষ নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে ভালবাসে। অপরের চোখে অপরূপ হয়ে ওঠার বাসনা তার জন্মগত। বিশেষ করে নারীর মনে এ বাসনা আরও তীব্র। তবে ঠিক কবে এবং কেমন করে যে মানুষ নিজেকে সাজাতে শিখল, বলা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন, মানুষ সাজতে শিখেছিল প্রকৃতিকে দেখেই। সে দেখেছিল তার চারপাশে অজস্র রঙ, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে নানা রঙের ফুল, সকাল-সন্ধ্যার নীলাকাশে লাল-সোনালি রঙের আলপনা, বাঘের হলুদ পিঠে কালো ডোরা, হরিণের বাদামী গায়ে সাদা

কোঁটা, চোখের কোলে অঞ্জনরেখা, ময়ূরের পেখমে বিচিত্র বাহার। অপার বিস্ময়ে রূপময়ী পৃথিবীর রূপান্তর দেখেছিল ঋতুতে ঋতুতে। কখনও কালো মেঘে বিদ্যুতের পাড়, কখনও সাদা মেঘের ঢেউ, কিংবা নীল জমির বুকে সাদা বকের পাঁতি। দেখতে দেখতে সেও সেদিন ধারণা করে নিয়েছিল এই সুন্দর পৃথিবীর স্রষ্টা একজন আছেন, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। তাঁকে খুশি করবার জন্যে তাকেও সুন্দর হতে হবে, সুসজ্জিত হতে হবে। সেই শুরু। ক্রমে একদিন সে তাকাতে শিখল পরস্পরের দিকে। প্রেয়কে দেখতে চাইল ভালবাসার প্রদীপ জ্বেলে। প্রেম যে সুন্দর। তখন থেকেই চলেছে মানুষের সুন্দরের সাধনা। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে আজও সে ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতেব দিকে।

প্রাচীন ভারতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সাজসজ্জা ভালবাসতেন। ভারতীয় নারীর অন্তরে ছিল আরো একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা। সে শুধু রূপসীরূপে অপরের মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করতে চায়নি, চেয়েছে মধুররূপে বিশেষ একজনের মনের কোণে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় অনুরাগে আপ্লুত হয়ে একটি স্থান করে নিতে। বহ্নিশিখা হয়ে জ্বলে ওঠার চেয়েও ঘরের কোণে মাটির প্রদীপ হয়ে স্নিগ্ধ আলো দিয়ে চোখ জুড়োবার সাধ তার কম নয়। তাই নিজেকে অত্যন্ত উগ্র রূপসজ্জায় শুধুমাত্র যৌন আবেদনময়ী করে তোলায় তার অনীহা, বরং লজ্জা তার অঙ্গে সঞ্চার করেছে অতিরিক্ত লাবণ্য। আমাদের পুরাণ বা মহাকাব্যে নারীর যে রূপচর্চার খণ্ডচিত্র পাই, সে অত্যন্ত মনোরম। সুসজ্জিতা নারীও মনোরমা। এদেশে নারী ও পুরুষের সাজ যে এক সময় প্রায় একই রকমের ছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া

যায়। উভয়েই নানারকম রঙের পোশাক পরতেন, নানা ধরনের গয়না পরতেন, চুল বাঁধতেন, টিপ পরতেন, কাজল পরতেন, এমনকি হাতে বড় বড় নখ রাখতেন ও তাতে রঙ লাগাতেন। পরে পুরুষের রূপচর্চায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। তার কারণ অনুসন্ধান করে মনে হয়, সাজসজ্জা ও রূপচর্চার জন্যে যে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে হত কর্মব্যস্ত পুরুষের হাতে সেই সময় ছিল না, ফলে ধীরে ধীরে সাজসজ্জার অনুশীলন শুধু ধনী ও নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতীয় চিত্র এবং ভাস্কর্যের দিকে তাকালেও আমরা একথার সমর্থন পাই।

ভারতীয় মেয়েদের সাজে যত বৈচিত্র্য আছে তত বৈচিত্র্য আর কোন দেশের মেয়েদের সাজপোশাকে নেই। স্থানভেদে এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেখানে একই বস্ত্র মেয়েরা পরছেন সেখানেও বৈচিত্র্য এসেছে পোশাক পরবার কেতা বা ঢঙে। একই শাড়ি কেউ পরছেন কুঁচি দিয়ে, কেউ পরছেন কাছা দিয়ে, কেউ টানছেন সামনে আঁচল, কেউবা ছড়াচ্ছেন পিঠের ওপর। একই শাড়ি পরার গুণে প্রতিটি নারীকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য ভারতীয় নারীকে দিয়েছে ব্যক্তিত্ব। অজন্তার গুহাচিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সুবেশা নারীদের মিছিল, অধিকাংশেরই বসন-ভূষণ এক নয়। তাঁদের সাজসজ্জার বৈচিত্র্য মনে দাগ কাটে বেশি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে অথবা হরপ্পার সমসাময়িক যুগেও যে মেয়েরা সাজতেন না, তা নয়। বরং দেখা গেছে ভারতীয় নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধাতুর তৈরি হার, কানবালা, আংটি, পায়ের মল ইত্যাদি। সোনা-রুপো ব্যবহার করতেন ধনীরা,

গরীবেরা পরতেন তামার গয়না—আংটি, মল, কানবালা ও কোমরে পরবার মেখলা বা চন্দ্রহার। শাঁখা, হাড়, ব্রোঞ্জ এবং পোড়ামাটি দিয়েও গয়না তৈরি হত। নর্তকীর হাতভরা চুড়ি দেখে এ যুগের রাজস্থানী পল্লীবধূর কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। মাতৃকা মূর্তির গলাতেও রয়েছে পাঁচনরী হার। সাজ বললে পোশাকের কথাও বলতে হয় কিন্তু তখনকার কোন বস্ত্র কালের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সূক্ষ্ম সিনদোন বস্ত্রের নাম মেসোপটেমিয়ায় শোনা যায়। সে হয়ত এই সিন্ধু উপত্যকাতেই তৈরি হত। পুরোহিতের গায়ে নকশা-কাটা চাদর দেখে বোঝা যায় এ যুগের মেয়েরাও নকশা আঁকা কাপড় পরতেন।

মানুষ কবে থেকে নিজের সাদাসিধে পরবার কাপড়খানিকে রঙিন ও চিত্রময় করে তুললে তাও জানার উপায় নেই। ধরে নেওয়া যেতে পারে, চিত্রময়ী প্রকৃতিকে দেখেই মানুষ অলঙ্করণের প্রেরণা পেয়েছিল। পোশাকের নকশা নির্বাচন খুব বড় জিনিস। একটি সুন্দর মেয়ের সমস্ত সাজকে নষ্ট করে দিতে পারে একটা অসুন্দর নকশা। ভারতীয় নারীরা প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন মনে হয়। তাঁদের সাজবার সরঞ্জামের মধ্যে আরশির স্থান খুব বড়। প্রাচীন মন্দিরের গায়ে কিংবা আঁকা ছবিতে দেখা যাবে নায়িকার হাতে একখানি আয়না, এই আয়না দিয়েই তাঁরা খুঁটিয়ে দেখে নিতেন তাঁদের সাজ নিখুঁত হচ্ছে কিনা। মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকেও পাওয়া গেছে মেয়েদের হাত-আরশি।

প্রথম নকশা কি করে হল তা নিয়ে অনেক গল্প আছে। অনেকেই বলেন, প্রথম নকশা হল বেলপাতার মত ত্রিপত্র, তারপর তার একটা পাতা থেকে তৈরি হল কলকা, আম, প্রদীপশিখা।

নাগারা বলে, আগে মানুষ সাদাসিধে একরকম কাপড় বুনত। একটা মেয়ে পুষেছিল একটা অজগর সাপ, সেই সাপটা সব সময় তার কোলে বসে থাকত, তাকে দেখে-দেখেই সে বুনে ফেলেছিল বিচিত্র নকশা। এসব গল্পে যাই থাকুক না কেন, আসলে মানুষকে অনেক ভেবেচিন্তেই তার পোশাক তৈরি করতে হয়েছিল। তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো রহস্যময় কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

বেদে ভারতীয় নারীর সাজসজ্জা প্রসঙ্গে কিছু কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। বস্ত্রকে বলা হয়েছে 'বাস'। অধোবাস এবং অধিবাস দুটোই ছিল। এছাড়া ছিল অন্তর্বাস বা নীবি এবং ধটি বা খাটো ধুতি—কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত এর ঝুল। ফ্যাব্রি সাহেবের মতে এইরকম একখানি ছোট ধটিই জড়ানো ছিল দ্রৌপদীর সুকুমার অঙ্গে। কুরু রাজসভায় এই ক্ষুদ্র ধটি উন্মোচনের আদেশ দিয়েই দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, 'There is not the remotest doubt that Draupadi wore a small piece of cloth, called sari, wrapped round her waist only, and no upper garment ; and when that sari was snatched from her hips, it was, indeed, a shameful act of male brutality, that kind of sari could perhaps best be called a dhoti.'

চার্লস ফ্যাব্রির সঙ্গে সবসময় একমত না হলেও স্বীকার করতেই হবে ভারতীয় নারীর সাজপোশাক নিয়ে তিনি বহুভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং ভারত-ভাস্কর্যই ছিল তাঁর প্রধান সহায়।

অনেকেই মনে করেন ধটি শব্দটি এ যুগেও চলে এসেছে ধুতি নামে।

শাড়ির পুরনো নাম ছিল শাটি কিংবা সারঙ। এই শাটির সঙ্গে ধটির সুস্পষ্ট প্রভেদ কি এবং কারা কোন সময় পরতেন তা এখনও জানতে পারিনি। মনে হয়, ধটির চেয়ে শাটি পরবর্তীকালের এবং পাড়হীন বস্ত্র ধটি আর পাড়সমেত বস্ত্র শাটি নাম পেয়েছিল, তবে এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছুই বলা চলে না। আর আমাদের শাড়ি তো এসেছে এই সেদিন। যাক, সে কথায় পরে আসা যাবে। এখন বৈদিক যুগের নারীদের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

বৈদিক যুগে নববধূর মাথায় থাকত অধিবাস বা উত্তরীয়। আর্য-শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী কুলবধূদের গুল্‌ফ পর্যন্ত লম্বা বস্ত্র পরা উচিত এবং নাভি ও স্তনদ্বয় থাকবে সংবৃত—

'ন নাভিং দর্শয়েৎ কুলবধূরাগুল্‌ফাভ্যাং বাসঃ পরিদধ্যাৎ
ন স্তনৌ বিবৃতৌকুর্যাৎ।'

ধরে নিতে পারি, বৈদিক নিয়মও ছিল কতকটা এরকমই। এসময় মেয়েরা চুল বাঁধতেন, তার মধ্যে দুটি খোঁপার নাম কুরীর ও কুম্ব। আর অলঙ্কার ? তাও ছিল বইকি ! বেদে নিষ্ক নামে একরকম হারের উল্লেখ আছে। আছে 'সৃঙ্কা' নামে হারজাতীয় আভরণের কথা। অন্যান্য অলঙ্কারও যে ছিল না তা নয়, তাদের সিঁথিময়ূর ও পায়ের অলঙ্কার খাদি পরতেও দেখেছেন কেউ কেউ। কিন্তু সুসজ্জিতা নারী বলতে আমরা যা বুঝি সেরকম একটি পূর্ণাঙ্গ নারীমূর্তির বর্ণনা বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা পাইনি। পেয়েছি পরবর্তীকালের সাহিত্যে।

হিন্দু রাজাদের আমলে ভারতীয় নারীদের সাজসজ্জায় বহু বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া কঠিন। প্রধানত সাহিত্য এবং ভাস্কর্যের ওপরেই আমাদের নির্ভর করতে হয় এবং তার ফলে মাঝে মাঝে ভুলভ্রান্তিও ঘটে; যেমন ধরা

যাক, নারীর বক্ষাবরণের প্রসঙ্গ। ফ্যাব্রি সাহেব আরো অনেকের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন প্রাচীন ভারতীয় নারীরা সাজ-সজ্জায় উদাসীন না হলেও তাঁদের দেহের উর্ধ্বাংশ অনাবৃত থাকত। অনেক সময় কাপড়ের প্রান্ত পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করেছে কিন্তু আঁচল হয়ে বক্ষ আবৃত করেনি। দেড়শ থেকে একশ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আঁকা অজন্তা চিত্রে যে নারীকে চোখে পড়ে তার বুকে কোন আঁচল নেই, নেই অন্য কোন পোশাকের আভাস। এবং বিভিন্ন ভারতীয় মূর্তিতেও এর পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ার মতো। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে আমরা এর বিপরীত চিত্র পাই। কবি কালিদাস উর্বশীর স্তনাংশুকের কথা বলেছেন। প্রাচীনকালে মেয়েরা বুকে বাঁধতেন একফালি বস্ত্রখণ্ড বা স্তনপট্ট। উর্বশীর স্তনাংশুক শুকপাখির বুকের মতো নরম ছিল, অরণ্যচারিণী শকুন্তলার স্তনবাস ছিল কঠিন বল্কলের। আসলে বক্ষ-সৌন্দর্য বজায় রাখবার জন্যে ভারতীয় নারীরা বহুদিন আগে থেকেই বক্ষাবরণ ব্যবহার করে আসছেন আধুনিক ব্রেসিয়ার অর্থেই। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে'ই তার উদাহরণ আছে।

শকুন্তলা : সহি অনসূএ, অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদমহি। সিঢিলেহি দাব ণং (সখি অনসূয়ে, খুব আঁট করে বল্কল বেঁধে প্রিয়ংবদা আমাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। একটু শিথিল করে দে)।

প্রিয়ংবদা : (সহাস্যে উত্তর দিলেন) এত্থ দাব পয়োহরবিত্থারইওঅং অওণো জোব্বণং উবালহ (এর জন্য তুমি তোমার যৌবনকেই দোষ দাও, যে যৌবন স্তনবিস্তারের জন্য দায়ী)।

বল্কল বা পট্ট যাই হোক, কিছু ব্যবহারের চল না থাকলে কালিদাস নিশ্চয় তার বর্ণনা করতেন না।

পাণিনির মতে, পোশাক হচ্ছে তিনরকম। ১. অন্তরীয়—যা গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে। ২. প্রাবার বা উত্তরীয়—যাকে চাদর বা ওড়না বলা হয় এবং ৩. বৃহতিক—যা কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েরা ব্যবহার করতেন নীবি, স্তনপট্ট এবং উত্তরীয়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন দেশের মানুষের আসা-যাওয়া লেগে ছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আসতেন বিভিন্ন দেশের শিল্পী—গায়িকা, নর্তকী, দাসী। কখনও রানী হয়ে আসতেন বিদেশিনী রাজকন্যা, নিয়ে আসতেন ভিনদেশী সাজসজ্জা—তাই ভারতে নানারকম সাজসজ্জার সংমিশ্রণ চোখে পড়বে, যা অন্য দেশের সাজপোশাকে ততটা চোখে পড়বে না। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও ছিল সাজসজ্জার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য : দ্রাবিড় কন্যারা যেমন করে সাজতেন, মৈথিলী কন্যারা নিশ্চয় সেভাবে সাজতেন না, তারপর যেদিন তাঁদের দেখা হল সেদিন থেকেই শুরু হল একের অপরের অনুকরণ, একে ঠিক অনুকরণ বলা চলে না, পরের সুন্দর সাজটি আত্মসাৎ করার প্রবণতা কম-বেশি সকলেরই থাকে, কারণ সবার মনেই আছে নিজেকে সুন্দর করে তোলার প্রবণতা। ভারতীয় নারীর সৌন্দর্য ও তাঁদের সাজসজ্জার শিল্পসম্মত রূপ ছড়িয়ে আছে ভারত-ভাস্কর্যে, অগণিত নারীমূর্তির মধ্যে। এই মূর্তিগুলি দেবীমূর্তি নয়, ভারতীয় শিল্পীদের দেবীমূর্তি নির্মাণের সময় খুব বেশি স্বাধীনতা ছিল না, নিজের ইচ্ছানুযায়ী দেবমূর্তির রূপকল্পনা করার অধিকার তাঁদের ছিল না, শাস্ত্রকে অনুসরণ করতে হত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পীর নান্দনিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল সুবেশা সুদর্শনাদের আশ্চর্য রূপ। দেবমূর্তির আশেপাশেই গড়া হত অসংখ্য যক্ষী, অপ্সরা, প্রেক্ষণিকা, মদনিকা, দীপলক্ষ্মী, বৃক্ষকা, সুরসুন্দরী, অলসকন্যা, রতি

ও নায়িকা—সবাই অতি সুন্দরী, যৌবনের দৃপ্ত লাবণ্যে গরীয়সী ও আবরণে-আভরণে সুসজ্জিতা। এরা নাকি পৃথিবীর কেউ নয়, কিন্তু পার্থিব লাবণ্য জড়িয়ে আছে এদের সর্বাঙ্গে, শুধু তাই নয়, আমাদের কাছে এরাই এখন প্রাচীন ও মধ্যযুগের নারীসমাজের প্রতিনিধি। এদের অনুসরণ করেই আমরা জানতে পারি সে যুগের আধুনিকা নাগরিকারা কেমন করে চুল বাঁধতেন, কি কাজল পরতেন, কি ধরনের গয়না পরতেন কিংবা কিভাবে অঙ্গে জড়াতেন সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকাজ করা বস্ত্রখানি। আবার প্রশ্ন উঠবে, তবে কি ভারতীয়রা অর্ধ-অনাবৃতাই থাকতেন ?

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, আমাদের মনে যে শালীনতার প্রশ্ন ওঠে সেটি সবসময়ই সমাজভাবনা থেকে উদ্ভূত। সমাজতত্ত্ববিদ বেলা দত্তগুপ্ত একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমরা ইউরোপের মেয়েদের আবক্ষ-উন্মুক্ত পোশাক পরতে দেখি, যার নাম 'দেকলেতে'। ইউরোপের মেয়েরা এ পোশাকে একটুও লজ্জিত নন। তাঁদের লজ্জা পায়ের উন্মোচনে। এদিকে চীনা মেয়েদের উঁচু কলারওয়ালা এবং বক্ষ আবৃত কিন্তু বাঁ পায়ের উরু পর্যন্ত একটি দিক খোলা পোশাক গ্রাহ্য ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চীনা মেয়েদের বুক থেকে গলা পর্যন্তই সবচেয়ে সঙ্কোচের কারণ। তাহলেই দেখি যে, দুটি উন্নত মহাদেশের মেয়েদের পোশাক ও তাদের শোভনীয়তা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি কত বিপরীত।' এভাবেই আমাদের মনে রাখতে হবে প্রাচীন ভারতীয় যুগের রীতিনীতির কথা। আজ যদি দিদারগঞ্জের যক্ষিণীকে দেখে আমরা তাকে নির্লজ্জ ভাবি তাহলে ভুল হবে। দেশ-কাল এবং পারিপার্শ্বিক বিচার না করে কোন মন্তব্য করা যায় না।

হিন্দুযুগের নারীদের সাজসজ্জার আরো উদাহরণ আছে সংস্কৃত

সাহিত্যে। হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন বাণভট্ট। তাঁর রচনায়, যেমন 'হর্ষচরিতে'র মালতীর কথাই ধরা যাক না। তার বেশবিন্যাস অতি মনোরম।

'তনুলতাটিকে তিরোহিত করে দিয়ে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল নির্মোক-লঘু একখানি কঞ্চুক, ধৌত শুভ্র নেতবস্ত্রে তৈরি। সেই সূক্ষ্ম কঞ্চুকের অন্তরালে মালতীর চন্দন-চর্চিত অঙ্গটিকে দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্ট-মোহন।···

'রত্নরচা স্ফটিকের মতো তার অন্তর্বাসে আস্তৃত ছিল কুসুম্ভবর্ণের পুলকের চূর্ণ। শুভ্র কঞ্চুকের উপর আমলকী ফলের মতো স্থূল মুক্তা সংগ্রহের হার ;···

'তার পূর্ণস্তনের শিখরে ছিল রত্নের একখানি প্রালম্বমাল্য ; সৌভাগ্যবান অতিথিকে স্বাগত নিবেদন করে হৃদয়দুয়ারে দুলছে যেন বন্দনার মালিকা। হাতে ছিল পান্নার মকরবসানো সোনার একখানি কঙ্কণ ; ···মালতীর অধরপুটটি অন্ধকার, চর্চিত তাম্বুলের কৃষ্ণিকায় ; যেন চাঁদের গায়ে লেগেছে সন্ধ্যার রাগরক্ত তিমির। আধখানি মুখের উপর নেমে এসেছিল নীল রঙের জালিকা। কানবালার ঝুরি নেমেছিল—নীলী গাছের নীল রঙ দিয়ে তৈরি, ময়ূরের কণ্ঠের মতো নীলিম।···তার কান থেকে আরো দুলছিল বকুল ফুলের মতো বড় বড় তিনটি মুক্তার দানা ; ললাটের মাঝখানে তমাল-শ্যামল তিলক-বিন্দুর কস্তুরীবাসিত কল্পনা ; কে যেন শীলমোহর পরিয়ে দিয়ে গেছে মালতীর মনোভব-সর্বস্ব মুখে। সিঁথির সীমন্তটিকে চুম্বন করে দুলছিল অরুণবরন পদ্মরাগমণির ধুকধুকি।'

[অনুবাদ : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর]

মালতীর সাজটি খুঁটিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব প্রাচীন

ভারতে নারীদের সাজসজ্জায় ছিল সূক্ষ্ম শিল্পরুচি এবং রঙ। কঞ্চুক ছিল একধরনের জামা, যাকে পাণিনি বৃহতিকের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এখনকার দিনের কামিজ বা কুর্তার সঙ্গে এর যেমন খানিকটা মিল আছে, তেমনি পেশওয়াজ ও শেমিজের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য রয়েছে। তবে অন্যান্য পোশাকের সঙ্গে এর তফাত এই, কঞ্চুক পরা হত সব পোশাকের ওপরে এবং তার সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে শরীরের রেখা ফুটে উঠত, দেখা যেত অন্তর্বাসের কারুকাজ। মুঘল চিত্রকলায় আমরা এরকম স্বচ্ছ পোশাক দেখতে পাই, মনে হয়, এটি তাঁরা তাঁদের স্বদেশ থেকে আনেননি, ভারতীয় নারীদের পোশাক থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

বাণের অপর গ্রন্থ 'কাদম্বরী'তে আছে চণ্ডালকন্যার সাজের কথা। সেও মন্দ নয়। '…স্থূলমুক্তার একখানি হার বেষ্টন করে আছে তার কণ্ঠ—গঙ্গাস্রোত কি জড়িয়ে ধরেছে নীল যমুনাকে, কানে দুলছে চন্দনের পল্লব ; …অঙ্গে আগুল্ফলম্বিত নীলকঞ্চুক, গুণ্ঠনখানি রক্তবরন,…চরণের নখরগুলি আরক্তিম,…জঘনে চন্দ্রহার, পায়ে স্বর্ণনূপুর…ললাটে গোরোচনার তিলক আঁকা…।'

[অনুবাদ : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর]

এখানেও নারীর রূপসজ্জায় সেই একই রীতি—রঙের প্রাবল্য। তবে চণ্ডালকন্যা দরিদ্র বলেই বোধহয় তার নীল কঞ্চুকটি স্বচ্ছ নয়। রূপরচনায় চণ্ডালীও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছে। তার কালো মুখে গোরোচনার তিলক, ফর্সা মালতীর কপালে ছিল কস্তুরীর টিপ। আসলে ভারতীয় নারীরা সকলেই ছিলেন রূপ-সচেতন। সৌন্দর্যবোধ ছিল তাঁদের সহজাত। যে কোন পোশাকই হোক না, সূক্ষ্ম বস্ত্রই তাঁরা ভালবাসতেন। ভারতের জলহাওয়ার উপযোগীও ছিল হালকা

সুতি বস্ত্র, যা পরে মসলিন নামে জগৎবিখ্যাত হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পীরা পাথরের বুকে নারীমূর্তি গড়বার সময় তাঁদের পোশাকের এই সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতার কথা মনে রাখতেন।

রামায়ণ-মহাভারতে নারীর আভরণের বহু প্রসঙ্গ আছে। বনে যাবার সময় সীতা ঋষিপত্নীকে দান করেছিলেন তাঁর অঙ্গের যাবতীয় অলঙ্কার, '…রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থান-পূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ূর, বলয় ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া সীতার অভিপ্রায়ক্রমে কহিলেন, সখে! তুমি তোমার ভার্যাকে গিয়া এই হার ও কণ্ঠমালা দেও; আমার অরণ্যসহচরী জানকী তোমায় এই রশনা দিতেছেন, বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ূব দিতেছেন।'

[বাল্মীকি রামায়ণ : হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, অনু]

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাল্মীকির যুগের এসব গয়না এখনও আমাদের দেশের মেয়েদের অঙ্গে শোভা পাচ্ছে। মহাভারতেও যে নানারকম অলঙ্কারের কথা নেই, তা নয়। সেখানে আছে মণি-চীরের কথা, অনেকে মনে করেন মণিচীর হচ্ছে মুক্তোবসানো সূক্ষ্ম বস্ত্র, দক্ষিণ ভারতে মসলিনে মুক্তো বসানোর চল ছিল। পৌরাণিক সাজসজ্জার প্রতিফলন ঘটেছিল আমাদের ভাস্কর্যে।

আগেই বলেছি, ভারতের শিল্পী ও ভাস্করেরা কঠিন পাথরের বুকে অজস্র অনুপমা সুন্দরীর মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। রূপলাবণ্যময়ী এই দেবাঙ্গনারা আজও দর্শকদের মুগ্ধ ও অভিভূত করে। গবেষকদের অনুমান, এই নারীরা দেবদাসীদের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। অসম্ভব নয়, মন্দিরস্রষ্টা ও শিল্পীর সঙ্গে মন্দিরের দেবদাসীদের

যোগ থাকার খুবই সম্ভাবনা। রূপদক্ষ দেবদীনের সঙ্গে সুতনুকা দেবদাসীর প্রণয়ের কথা আছে যোগীমারা পর্বতের গুহালিপিতে। তা সে যাই হোক, এই মূর্তিগুলি আমাদের জানতে সাহায্য করে তাদের উদ্ভবের সমসাময়িক সময়ে সাজপোশাকের রীতি কেমন ছিল। নারীরা কেমন করে চুল বাঁধতেন, কেমন করে টিপ পরতেন, কেমন করে ঠোঁট রাঙাতেন, কেমন করে প্রসাধন করতেন সবই ধরা আছে শিল্পীদের নিপুণ হাতের কাজে। দিদারগঞ্জের চামরধারিণী যক্ষী, সাঁচীর শালভঞ্জিকা কিংবা মথুরার সখীকে আমরা যদি ভাল কবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব এঁদের অলঙ্কারের সঙ্গে সেই মহেঞ্জোদাড়োর একহাত চুড়ি পরা নর্তকীর সাদৃশ্য আছে। এঁদের হাতেও মোটা মোটা চুড়ির গোছা—কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত হাত সেই চুড়িতে ঢাকা। এঁদের পায়েও রয়েছে বেশ মোটা মল। কারলা গুহামন্দিরেও যে মানবীমূর্তিগুলি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের অঙ্গেও প্রায় একই ধরনের গয়না দেখে আমরা অনুমান করে নিতে পারি, শিল্প-ভাস্কর্যের যে নিদর্শন গোড়ার দিকে আমরা পাচ্ছি সেখানে সূক্ষ্মতার অভাব ছিল। যত দিন গেছে নারীদের অলঙ্কারে এসেছে সূক্ষ্মতা। পায়ে মলের বদলে নূপুর, হাতে একহাত মোটা চুড়ির বদলে কারুকাজ করা কঙ্কণ বলয়, গলায় মোটা হারের বদলে একাধিক সরু হার, কণ্ঠি, মুক্তোর মালা, কানে বড় বড় দুলের বদলে কুণ্ডল, সাদা সাপটা মেখলার বদলে কারুকাজ করা কাঞ্চী—এ সবই চোখে পড়বে খাজুরাহোর সুরসুন্দরী, ভুবনেশ্বরের অলসকন্যা, কোণারকের অপ্সরা কিংবা বেলুর-হালেবিদের মদনিকাদের সাজসজ্জায়। এঁদের হাতে আছে আর্মলেট, গলায় লম্বা মালা, টিকলি বা অন্য শিরোভূষণ, আংটি সব কিছু। এক-একজনের গয়নার সূক্ষ্ম নকশা একালের

সুন্দরীদেরও ঈর্ষা উৎপন্ন করে, করতে পারে কারণ একসময় ভারতের অলঙ্কার শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

এইসব মূর্তি থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে প্রধান বাধা হচ্ছে, এই মূর্তিগুলি অত্যন্ত স্বল্পবাসা। অজন্তার গুহাচিত্র সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। রঙে রেখায় সুষমায় যাদের দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, দু হাজার বছর পরেও রাজমহিষীর মুক্তোর মালার বিদ্যুৎ ঝিলিক যখন চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তখনও লক্ষ্য করি সুন্দরীদের সকলেই স্বল্পবাসা, সকলেরই ঊর্ধ্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত। এদের পাশে-পাশেই রয়েছে চিত্রিত ব্লাউজ পরা অজন্তার নর্তকী, কুষাণ স্থাপত্যের নারীমূর্তিগুলির অঙ্গেও রয়েছে সেলাই করা জামা। তক্ষশিলার হারিতির সর্বাঙ্গে শাড়ির মতো আবরণ রয়েছে আর গোয়ালিয়রের সুন্দরী সেই রাজকন্যা ? না, অসামান্যা রূপসী সেই কাঠের পরীর কথা বলছি না। পরীর কোমরে নকশা-কাটা ও পাড় দেওয়া বস্ত্র-খণ্ড থাকলেও ঊর্ধ্বাঙ্গে কোন দৃশ্যমান পোশাক নেই, আছে সপ্তম শতাব্দীর সেই মূর্তিটিতে। বাঁ দিকের কাঁধের কাছ থেকে নেমে এসেছে কারুকাজ করা বোতাম ঘর, যা এখনও লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের কামিজ বা পাঞ্জাবিতে দুর্লভ নয়। এই মূর্তিটি আরো প্রমাণ করে নারীদের সূক্ষ্ম বসনকে শিল্পীরা কিভাবে অদৃশ্য করে তুলে ধরে তার নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে এসেছিলেন। ইউরোপের শিল্পীদের আঁকা ভেনাসকে দেখে আমরা যেমন ধরে নিতে পারি না সেখানকার সব নারীই নগ্ন থাকতেন, ভারতীয় মূর্তিগুলি সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। শালীনতার প্রশ্ন অবশ্য এখানে নেই, রয়েছে সৌন্দর্যের প্রশ্ন এবং সে প্রশ্নের উত্তরে এটুকুই বলা যায় যে ভারত-সুন্দরীরা আবরণের মোহময় আড়ালটিকে কখনই অস্বীকার করেননি, তাঁরা কখনই নগ্ন-

ভাবে নিজেদের প্রকট করতেন না। পোশাক পরার চল এঁদের মধ্যে ছিল। আর্যরা আসার আগে এদেশে ছিলেন দ্রাবিড় কন্যারা, তাঁরা চুল বাঁধতেন নানা ছাঁদে, কাঁচুলির ব্যবহারও তাঁরা জানতেন। আর্যনারীরা এলেন এক বস্ত্র পরার রীতি নিয়ে, বুকে ছিল রোমান সেনেটরদের মতো চাদর বা আঁচলের আবরণ। দুটি ধারার যখন মিলন হল তখন বড়রকমের বিরোধ দেখা দিল বলে মনে হয় না। উভয় সমাজের নারীরা দুটিকেই গ্রহণ করলেন। এই গ্রহণ করার প্রবণতাই ভারতীয় নারীর সাজকে বিচিত্র করে তুলেছে। সব দেশের এবং সব যুগের পরিচ্ছদই রূপবদল করে ভারতীয় নারীদের অঙ্গে উঠেছে, তবু ভারত-সুন্দরীরা তাঁদের স্বকীয়তা হারাননি। এটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণত দেখা গেছে নারীর সাজসজ্জায় রঙ ও নকশা দুটি প্রধান বস্তু। এখনকার দিনের সাজের অনেকটাই জুড়ে থাকে ম্যাচিং কালার কম্‌বিনেশন। কখনও এক রঙের সাজে, কখনও বর্ণ-বৈপরীত্যে, আবার কখনও দুটি রঙের বর্ণসুষমায় আজকের পোশাক অনন্য হয়ে ওঠে। এর ওপর আছে নানারকম নকশা বা ডিজাইন। 'হর্ষচরিতে'র মালতীর সাজেও রঙের বাহার ছিল। সাদা কঞ্চুক, লাল অন্তর্বাস, নীল ঘোমটা। আর 'কাদম্বরী'র চণ্ডালকন্যার পরনে ছিল নীল কঞ্চুক, সঙ্গে লাল ঘোমটা। ফর্সা মেয়ের মুখে কস্তুরীর টিপ, কালো মেয়ের কপালে গোরোচনার তিলক। এই বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় নারীরা প্রথম থেকে কনট্রাস্ট বা বিপরীতধর্মী রঙের একত্র সমাবেশ যেমন পছন্দ করতেন তেমনি এই বর্ণ বৈচিত্র্য তাঁদের সাজকেও প্রকট করে তুলত।

'হর্ষচরিতে' বাণ কাপড় রঙ করবার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমরাও দেখতে পাই—

'যাঁরা কাপড় ছাপার কাজে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন—দেখা গেল তাঁরা সহস্র সহস্র বস্ত্র চিত্রিত করে ফেলে রেখেছেন··· আনন্দিত রজকসঙ্ঘ সহস্র সহস্র বস্ত্র রাঙিয়ে আবার রাঙাচ্ছে। সেইসব রঙছাপা কাপড়ের দুটি পাড় ধরে সহস্র সহস্র পরিজনের সে কি ছায়া-কাপড় শুকানোর নৃত্য! সেইসব শুষ্ক বসনের উপর, বাঁকা-আঁকা পংক্তির সারিটানা যে সব আশ্চর্য সুন্দর বাহার আঁকা জিনিস ছিল—সে একটি দেখবার মতো জিনিস! কুঙ্কুমের স্থাসক! এত দ্রুত, এত স্রুত, এত ঘটা!' [অনুবাদ : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর]

এক এক সময় মনে হয়, সত্যিই কি প্রাচীনকালে, প্রাচীন বলতে বৈদিকযুগই যে শুধু বোঝায় তা নয়, হর্ষবর্ধনের সময়কেও বোঝায়, এত রঙ ছিল এবং সেই রঙের ব্যবহার বস্ত্রশিল্পীরা জানতেন ? কেমিক্যাল রঙের ব্যবহার শুরু হবার আগে উদ্ভিদজাত রঙই ছিল আমাদের শিল্পীদের হাতে। তাঁরা অবশ্য নানারকম মিশ্রণ ঘটিয়ে বহু রঙ তৈরি করতে পারতেন। মূল রঙ ছিল তিনটি—লাল, নীল ও হলুদ। এগুলির নানারকমের মিশ্রণে তৈরি হত—খয়েরি, কমলা, সবুজ, কালো প্রভৃতি রঙ। এছাড়া ভারতীয়রা শামুকের খোলা পুড়িয়ে দুষ্প্রাপ্য বেগনে রঙ তৈরি করতে পারতেন। এই রঙটি যেমন দামী তেমনি টেকসই। এখনও আমরা মিউজিয়ামে রাখা পুরনো বেনারসী শাড়িতে এই লালচে-বেগনে রঙের প্রাধান্য দেখতে পাব। শোনা যায়, এই লালচে-বেগনে রঙ ভারত থেকে যেত বিদেশে, বিশেষ করে রোমে। অন্যান্য যেসব রঙ ভেষজ থেকে তৈরি হত সেগুলিও মনোমুগ্ধকর এবং স্থায়ী হত সন্দেহ নেই। শিউলি আর নটকান দিয়ে কাপড় রঙ করার চল্ এই সেদিনও ছিল, ভারত-ভাস্কর্যে যে সুন্দরীদের আমরা পেয়েছি তারাও রঙিন বস্ত্র পরত, শুধু তাই নয়, রঙ

মিলিয়ে পরত গয়না। পাথরের বুকে এই রঙ ধরা পড়েনি, কাঠের যেসব মূর্তি কালের করাল মুঠি থেকে রক্ষা পেয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে রঙের আভাস। অজন্তার চিত্রে রঙের অভাব নেই, কিন্তু প্রতিদিনই সে রঙ তার আশ্চর্য দীপ্তি নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে থেকে। রূপসীদের মিছিলের যে ছবিটা এখনও আছে তাতে পোশাক-আশাকের অভিনবত্ব, বর্ণবিন্যাস, অলঙ্কার আর শিরোভূষণের বৈচিত্র্য ভারতীয় সাজসজ্জার উদাহরণ হিসেবে মনে রাখা দরকার। এখানে কোন নারী স্বল্পবাসা, কারও বুকে স্তনপট্ট, কেউবা পরেছে হাতাওয়ালা বুটিদার ব্লাউজ, কারুর বস্ত্রে ডোরা, কারুর বা নকশা। মাথায় কেউ পরেছে মুকুট, কেউ জড়িয়েছে রঙিন পাগড়ি, কারুর গলায় সাতলহর মুক্তোর মালা, কারুর বা সাদাসিধে পেনডেণ্ট, কারুর খোঁপায় ফুল আছে, কেউ বেঁধেছে মাথার ওপর চূড়া। কারুর হাতে একটা বালা, কেউ পরেছে চুড়ির গোছা। এসব থেকে একটাই অর্থ পরিস্ফুট হয়, ভারতে আজকের মতো সেদিনও মেয়েরা নানাভাবে সাজতেন। সতেরো নম্বর গুহার কৃষ্ণা রাজকুমারীর গলার রঙিন বা জড়োয়া নেকলেসটি এ যুগের সুন্দরীর কণ্ঠেও বেমামান হবে না।

আমাদের রাগ-রাগিণীর রূপকল্পনাতেও নিখুঁত রূপসজ্জা ও বর্ণবাহারের সন্ধান মেলে। পাথর যতদিন থাকে, ছবি ততদিন থাকে না। প্রাচীন ভারতে চিত্রচর্চার চল্ ছিল। অনেক পরে আঁকা হলেও ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ছবিতে আমরা প্রাচীন ভারতীয় সাজের কিছুটা আভাস পাই, এর সঙ্গে তাঁরা পরতেন সুনির্বাচিত অলঙ্কার। দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শিল্পীর কল্পনায় ভৈরবী রাগিণীর সাজ সাদা, তার সঙ্গে রক্ত-লাল কোমরবন্ধ ও গলায় একটি স্বর্ণচাঁপার মালা। গৌড়ী রাগিণীও পোশাক পরেছেন রাজহাঁসের পাখার

মতো সাদা, তাঁর কানে দুটি নবমুকুলিত আমের মঞ্জরী। কামোদিনী রাগিণীর সাজ স্বচ্ছ হলুদ, পোশাকের নিচে রক্তিম অন্তর্বাস। আবার খাম্বাবতী রাগিণীর স্বচ্ছ হলুদ পোশাকের নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ কাঁচুলি, গলায় মুক্তোর মালা, চুলে স্বর্ণালঙ্কার। দেশী রাগিণীর পরিচ্ছদের রঙ পলাশ ফুলের রঙের মতো লাল, সর্বাঙ্গে মণিময় অলঙ্কার। মালশ্রী রাগিণীর গায়ের রঙ গাঢ় গোলাপী, তাঁর অঙ্গে হলুদ পোশাক কিন্তু সর্বাঙ্গে লাল, নীল, সাদা ও হলুদ পাথর বসানো অলঙ্কার। আশাবরী রাগিণীর কর্পূরচর্চিত অঙ্গে ময়ূর পেখমের পরিচ্ছদ, মাথাব চুল চূড়া করে মাথার ওপরে বাঁধা, কণ্ঠে গজমুক্তার মালা, হাতের কঙ্কণে সাপের নকশা। এঁদের সবার সাজপোশাকেই রঙের বৈপরীত্য চোখে পড়ার মতো। কিন্তু একই রঙের সাজ এবং অলঙ্কার পরার নজির, যা আজকের ফ্যাশানের চূড়ান্ত, তাও সেকালে ছিল। মল্লার রাগিণীর গায়ের রঙ চাঁপা ফুলের মতো উজ্জ্বল। তাঁর অঙ্গে পীতাম্বর বা হলুদ বস্ত্র, তিনি চুলে চাঁপা ফুলের মালা পরেছেন, দুটি কানে চাঁপা ফুলের দুল, হাতের গয়নাও তৈরি হয়েছে চাঁপা ফুল দিয়ে। সাধারণত এ ধরনের সাজ বিশেষ দেখা যেত না। আমাদের প্রশ্ন, এ সবই কি শুধু শিল্পীর কল্পনা, না, তাঁদের চোখের সামনেই ছিলেন এই সুসজ্জিতা নারীরা। রাগমালার চিত্র অবশ্য পরে আঁকা হয়েছে কিন্তু রাগমূর্তিগুলি কল্পিত হয়েছিল অনেক আগে।

সূক্ষ্ম সুতির বস্ত্র ছাড়াও ছিল রেশম ও পশমের ব্যবহার। পোশাকের নামগুলিও ভারী সুন্দর—অধিবাস, কঞ্চুক, কাঁচুলি, অঙ্গিকা, মেখলা, ওড়না, ধটি, শাটি, বাস, দ্রাপি, নীবি, দুকূল, অৎকল, উষ্ণীষ, উত্তরীয়, অন্তরীয়, অপ্রপদিনা, কূর্পাসক, চীনাংশুক প্রভৃতি। কবে থেকে মানুষ পোশাক পরতে শুরু করেছে তা জানার সঠিক

উপায় নেই। যেদিন থেকে মানুষের অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত জীবন বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেদিন থেকে সভ্যতার শুরু, সম্ভবত সেদিন থেকেই মানুষ সাজপোশাক সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। প্রথমে যা তার দেহকে শীত-গ্রীষ্মের হাত থেকে রক্ষা করত, পরে তাই হয়ে উঠল তার লজ্জা নিবারণের উপায় এবং একই সঙ্গে নিজেকে সুন্দর করে তোলার উপকরণ। অনুমান করা যেতে পারে, রেশমের আবিষ্কারের আগে থেকেই ছিল কার্পাস তুলো থেকে তৈরি করা সুতিবস্ত্র। বদরা-কার্পাস থেকে তৈরি হত বাদর-বসন। বাণভট্ট লিখেছেন ‘মাকড়সার লালা তন্তুজাত উত্তরবাস’ বা ওড়নার কথা। আমাদের অনুমান এগুলি সবই হচ্ছে মসলিন। মাকড়সার জাল থেকে তৈরি না হলেও জালের মতোই সূক্ষ্ম এই বসনগুলি বাণের ভাষায়—

‘সর্প নির্মোকের মতো চুড়িদার,
কচি কলাগাছের থোড়ের মতো কোমল,
নিঃশ্বাস দিয়ে সেগুলিকে হরণ করে নেওয়া যায়,
স্পর্শ করলে বোঝা যায়—
যে—আছে।’ [অনুবাদ : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর]

সাজ প্রসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের বস্ত্রের কথা মনে পড়ে। এক এক জায়গার কাপড়ের নাম সেই জায়গার নাম অনুযায়ী হয়। যেমন, বেনারসী, বালুচরী, চান্দেরি, পাটোলা, পয়থানী, সম্বলপুরি, পোচমপল্লী, কাঞ্জীভরম ইত্যাদি। এই নামকরণ পরবর্তীকালের। তবে পুরনো দিনেও ছিল কাশিক বস্ত্র কিংবা চীনাংশুক। নাম থেকেই বোঝা যায় এদের একটি বোনা হত কাশীতে, অপরটি আসত চীনদেশ থেকে। গৃহ্যসূত্রে চাররকম বস্ত্রের কথা আছে—ক্ষৌম, শান, কার্পাস এবং ঔর্ণ। আবার অন্যত্র আছে—

'ক্ষৌম-কার্পাস-কৌশেয়-রাঙ্কবাদি বিভেদতঃ।'

এই বিভেদের কারণ 'ত্বক ফল কৃমি রোমভ্যঃ সম্ভবত্বাচ্চতুর্বিধম্' অর্থাৎ ত্বক, ফল, কৃমি ও রোম এই চারটি উপাদান থেকে বস্ত্র উৎপন্ন হয় বলেই এরা স্বতন্ত্র। সে যুগে নাইলনজাতীয় কৃত্রিম তন্তু ছিল না, থাকলে সেটি হয়ত হত পঞ্চম উপাদান। ভারতীয়রা ক্ষৌমবস্ত্রকে খুব পবিত্র মনে করতেন। পুজো-আর্চায় পরতে হত ক্ষুমা বা পাটের শাড়ি। প্রাচীনকালে ক্ষৌমবস্ত্র তৈরি হত অতসীজাতীয় গুল্মের ছাল থেকে। কাপাস তুলো থেকে তৈরি হত কার্পাস বা বাদর। বাণভট্টের বর্ণনা থেকে আমরা সূক্ষ্ম বাদর-বসনের কথা জানতে পেরেছি। বলা বাহুল্য চলতি কথায় একেই আমরা বলি মসলিন। মসলিন নামটা বিদেশীদের দেওয়া। কেউ কেউ মনে করেন, মসুলিপটম থেকে কিংবা সেকালের অন্যতম প্রধান বন্দর মসৌলের নামেই মসলিনের নাম হয়েছে। এই কার্পাস বা বাদর-বসন ভারতীয় নারীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ধরে নিতে পারি সেকালের ধনী ও বিলাসিনীরা সবচেয়ে ভালবাসতেন সূক্ষ্ম বাদর-বসন বা সেই কাপড়ের তৈরি করা পোশাক। এই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম বস্ত্রই ভাস্করের হাতে অদৃশ্য হয়ে পরবর্তীকালে ভারতীয় নারীকে এক বিচিত্র প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে। মাঘের 'শিশুপালবধে' আছে—

'ছন্নেষ্বপি স্পষ্টতরেষু যত্র স্বচ্ছানি নারী-কুচমণ্ডলেষু।
আকাশ-সাম্যং দধুরম্বরাণি ন নামতঃ কেবলমথতোঽপি॥'

অর্থাৎ দ্বারকার নারীদের স্তন আবৃত হলেও স্পষ্ট দেখা যেত।

অপরদিকে ক্ষৌমবস্ত্র ছিল পবিত্রতার প্রতীক। রামায়ণে কৌশল্যা ও অন্য রানীরা ক্ষৌমবস্ত্র পরে বধূবরণ করেছিলেন। এখানে মনে রাখা দরকার, প্রাচীনকালে নারীরা রেশম বা সিল্ককে মোটেই পবিত্র

বলে মনে করতেন না। বরং প্রাণীকে হত্যা করে সিল্ক সংগ্রহ করা হয় বলে শাস্ত্রকাররা মনে করতেন সিল্ক পরে কোন শুভ কাজ করা উচিত নয়। হিন্দুরা পছন্দ করতেন মুক্তার কাপড়। আজকের দিনে আমরা যাকে র-সিল্ক বলি কতকটা সেই ধরনের। পোকা গুটি কেটে বেরিয়ে গেলে সেই সুতো দিয়ে যে কাপড় তৈরি হত তা মসৃণ না হয়ে একটু গিঁট গিঁট হত—হিন্দুরা মনে করতেন এই কাপড় পরা ভাল কারণ এতে প্রাণী-হত্যা হয় না, পোকা মুক্ত হয়ে চলে গেছে তাই মুক্তা।

সিল্ককে প্রাচীনকালে বলা হত কৌশেয়। সীতাকে দেবী অনসূয়া যে দিব্য বস্ত্র দিয়েছিলেন তা কৌশেয়। বলা বাহুল্য ঔজ্জ্বল্য আর কোমলতা দুই-ই ছিল সিল্কে, আর এই দুটি গুণে রেশম খুব সহজেই ভারতীয় নারীর মন জয় করেছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। মধ্য এশিয়া এবং চীনে রেশম বয়ন হত নিয়মিত ভাবে। চীনই এর আবিষ্কারক। বহুদিন ধরে চীন এর নির্মাণ-কৌশল ভিন্ন দেশের লোককে জানতে দেয়নি। অথচ ভারতে চীনাংশুক ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে' চীনাংশুকের কথা আছে, আছে 'কাদম্বরী'তেও। কালিদাস থেকে বাণ সকলেই এর কথা বলেছেন। এছাড়া আমরা আর একটা নাম পাই নেত্রাংশুক, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নেতের শাড়ি কিংবা 'পাটনেত'। মুকুন্দরাম লিখেছেন, 'বুনে নেত পাটশাড়ি।' এই নেতের শাড়ি হল পাড় বসানো থান।

নারীদের শাড়িতে বা ধুতিতে যাই হোক না কেন, পাড় ও আঁচল কবে থেকে বসানো শুরু হয়েছে জানা নেই, কিন্তু পোশাকের ক্ষেত্রে সম্ভবত এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কাপড় রঙ করার কৌশল মানুষ আগেই শিখেছিল। ব্যক্তিবিশেষের এক এক রঙের কাপড়

পরবার প্রবণতা অনেককাল আগে থেকেই ছিল এবং সেই থেকেই নীলাম্বর পীতাম্বর প্রভৃতি নামে ব্যক্তিরা চিহ্নিত হয়ে আসছে। তান্ত্রিকদের রক্তবস্ত্র ও সন্ন্যাসীদের গেরুয়া পরবার রীতিও এইরকম। কিন্তু পাড় ও আঁচল বস্ত্রকে পুরুষের পোশাক থেকে নারীর পোশাকে পরিণত করেছে। অবশ্য পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রেও যে পাড় থাকে না তা নয়, রাজপোশাকে বা ধুতিতেও অল্প পাড় থাকে, কখনও ঢালা, কখনও ফুলকাটা। চওড়া পাড় ধুতি এবং আধহাত জরির 'ধাক্কা' দেওয়া ধুতিও দুর্লভ নয়, তবু পাড় এবং আঁচল যেন নারীর পোশাকেই—শাড়ি বা ওড়নাতে একচেটিয়া। মজার কথা এই যে, এই বৈশিষ্ট্যটি শুধুমাত্র ভারতীয় নারীর পোশাকেই দেখা গেছে। সারা বিশ্বের আর কোন দেশের মেয়েদের সাজে পাড় বা আঁচলের ভূমিকা নেই। ভারতের পুরনো দারুমূর্তিতে এর উদাহরণ দুর্লভ নয়। যেমন ধরা যাক গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত কাঠের পরীর কথা। তার কোমরে জড়ানো আছে একটি বস্ত্রখণ্ড—তার পাড়ও আছে, ভেতরে কাজ করা নকশাও আছে। কিন্তু অধিকাংশ মূর্তিতেই আমরা কোন পাড় দেখতে পাই না, পাই না কোন সাজপোশাকের বর্ণনার মধ্যেও। বাণভট্টের বর্ণনাতে নানারকম বস্ত্রের কথা আছে, আছে রঙ-ছাপা নকশার কথা, নেই পাড় বা আঁচলের কথা। কালিদাস পার্বতীর বধূসজ্জার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় পার্বতী পরেছেন সাদা ধবধবে ক্ষৌম বস্ত্র—সেই হল বিয়ের সাজ—তাতে পাড় বা আঁচল কিছুই ছিল না।

সিল্ক বা রেশমের কাপড় তার সৌন্দর্য ও কোমলতার গুণে শীঘ্রই নারীদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। রামায়ণে কৌশেয়কে দিব্য বস্ত্র বলেছেন ঋষি, শুধু তাই নয়, এই কাপড় মলিন হবে না সে কথাও

প্রকারান্তরে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য সব বস্ত্রের তুলনায় সিল্কই প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং এখনও পর্যন্ত ভারতীয় নারীরা সিল্কের শাড়ি পরতেই সবচেয়ে ভালবাসেন বললে ভুল বলা হবে না। আমাদের অনুমান সিল্কের সুদিন আসে মুঘলযুগে এবং ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প এ সময়ই চরমোৎকর্ষ লাভ করে। মসলিনের খ্যাতি আরো বিস্তৃত ও প্রাচীন সন্দেহ নেই, সিল্কের স্থান তার পরেই। পশম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের আবহাওয়া উষ্ণ বলে শৌখিন পশমী পোশাকে ভারতীয় নারীরা নিজেদের সাজাতে ভালবাসতেন না, বরং আদর ছিল চাদর বা শালের, তবে সেও পরবর্তীকালের কথা।

সাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রসাধনের কথা। 'যেমন আছো, তেমনি এসো' একালের কথা। ভারতীয় মেয়েরা নিজেদের সাজাতেন প্রকৃতির ভাঁড়ার শূন্য করে। লাক্ষা থেকে হত আলতা, হিঙ্গুল দিয়ে রাঙানো হত হাতের নখ, কুঙ্কুম দিয়ে টিপ। চন্দন দিয়ে মুখের অলকা-তিলকা আঁকা হত। কস্তুরী দিয়ে বুকে আঁকা হত পত্রলেখা। কাজল তো পরতেনই, পাউডারও মাখতেন। চন্দনচূর্ণ ছাড়াও তাঁরা একটি সুগন্ধি পাউডার তৈরি করতেন দালচিনি, এলাচগুঁড়ো ও খসখস মিশিয়ে; তারপর তাতে মেশানো হত কস্তুরী ও কর্পূর। আয়ুর্বেদিক মতে দালচিনি পড়ন্ত যৌবনশ্রীকে উজ্জীবিত করে। এছাড়া একটুকরো লাউ প্রতিদিন মুখে ঘষে যৌবনশ্রী অক্ষুণ্ণ রাখতেন নারীরা। সেইসঙ্গে খেতেন একটুকরো ঘৃতপক্ব রসুন বা রসোনা।

নারীর রূপের একটা বড় আকর্ষণ হচ্ছে কেশ। চুলের জন্য ছিল আমলা ও তিল তেল। টাকের ওষুধ হিসেবে ছিল কনক ও

ধুতুরার তেল। কলপ সেকালেও ছিল। হরীতকীর কষ ও ভৃঙ্গরাজ পাতার রস ব্যবহার করতেন নারীরা, দ্বিতীয়টি নাকি পাকা চুলকে কালো করত। সুগন্ধির ওপর ভারতীয় মেয়েদের আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁরা নানারকম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। চন্দন ও কস্তুরীর নিজস্ব গন্ধ তো ছিলই, এছাড়া জটামাংশী নামে এক সুগন্ধি গাছের শেকড় দিয়ে তাঁরা পোশাককেও সুগন্ধি করে নিতেন। সেকালে রজকরা শুধু কাপড় কাচত না, রঙ ও সুগন্ধি করার কাজও করত।

বর্ণপ্রসাদকরূপে হলুদ, ত্বক মসৃণ করার জন্য দুধের সর, সাবানের বদলে ক্ষার, ঠোঁট রাঙাবার জন্যে পান, চোখে পরবার জন্যে কাজল—রূপটানের এসব উপকরণ তো ছিলই। কেশকে তাঁরা সুগন্ধি করতেন ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকিয়ে। অগুরু, চন্দন ও কস্তুরী দিয়ে ধূপ তৈরি হত। খুব ঘাম হলে তাঁরা মাখতেন চন্দন, কর্পূর ও বেনা-মূলের রস একত্র করে। আগেই বলেছি, সেকালে মেয়েরা টিপ পরতেন রঙ মিলিয়ে, ফর্সা মুখে কস্তুরী, কালো মুখে গোরোচনার টিপ বেশি মানানসই হত। এছাড়া আরো নানারকমের টিপ ছিল—চন্দন, কুঙ্কুম, সিন্দুর, খদির (খয়ের), অভ্র, কাজল, কাঁচপোকা, পাতা কেটে নকশাও করা হত নানারকম। বৈশালীর মেয়েরা খয়েরের সঙ্গে অভ্র মিশিয়ে টিপ পরতেন, তার পাশে আঁকতেন শ্বেত চন্দনের পত্রলেখা। অভ্র মেশানো খয়েরের টিপ হীরের মতো জ্বলজ্বল করত। ভারতীয় নারীর প্রসাধনের কয়েকটি সুন্দর ছবি ধরা আছে শিল্পীদের হাতে—অজন্তার রানীর প্রসাধন, খাজুরাহোর নর্তকীর পায়ে আলতা-পরা কি চোখে কাজল-পরা, চিতোরের দর্পণধারিণী মোহিনী কিংবা বেলুরের মদনিকাদের প্রসাধন—মুখ দেখা কি টিপ

পরার অনুপম মূর্তিগুলি ভোলবার নয়। আরো দেখা যাবে—কেউ আয়না দেখছেন, কেউ চুল বাঁধছেন। প্রসাধনের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরিচারিকা কিংবা সৈরিন্ধ্রী।

কালিদাসের ‘কুমারসম্ভবে’র সপ্তম সর্গের ছয় থেকে ছাব্বিশ—শ্লোকগুলিতে পাওয়া যায় উমার বধূসজ্জার অনুপম চিত্র। প্রচলিত একটি অনুবাদ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় অংশ অনুসরণ করা যাক, ‘লোধ্রচূর্ণের দ্বারা তাহার (উমার) অঙ্গের স্বাভাবিক তৈল অপসারিত করা হইল, ঈষৎ শুষ্ক কালেয় নামক গন্ধদ্রব্যে অঙ্গরাগ সম্পাদিত হইল।··· মঙ্গল স্নানান্তে বিশুদ্ধগাত্রী উমা পতিসঙ্গমোচিত ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া বৃষ্টি সলিল সিক্তা প্রস্ফুটিত কাশ পুষ্পরাজিতা বসুন্ধরার ন্যায় শোভা পাইলেন।··· তৎপরে কোন রমণী ধূপতাপে পার্বতীর কেশপাশের আর্দ্রতা অপসারিত করিলেন এবং তন্মধ্যে কুসুম বিন্যাস পূর্বক দূর্বাদলসংযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ মহুয়া পুষ্পের মালা সুন্দরভাবে বন্ধন করিয়া দিলেন। পুবনারীগণ পার্বতীর শ্বেতাগুরুচর্চিত অঙ্গে রোচনাঙ্কিত পত্রাবলী রচনা করিয়া তাহার শোভা সংবর্ধিত করিলেন···তাঁহার কর্ণার্পিত নবাঙ্কুর লোধ্রকষায় বিলেপনে, বিশদ এবং গোরোচনা নিক্ষেপে একান্ত গৌরবর্ণ গণ্ডদেশে বর্ণোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল।··· সুগঠিত গাত্রী উমার রেখাবিভক্ত ওষ্ঠ মধুচ্ছিষ্ট (মোম) স্পর্শে অধিকতর লোহিতবর্ণ হইয়া এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। ···উমার চরণ দুটি অলক্তকে রঞ্জিত করিয়া···প্রসাধিকা রমণীরা পার্বতীর পূর্ণবিকশিত শতদলবৎ নয়ন যুগল দর্শন করিয়া···তাহাতে নীলবর্ণ অঞ্জন প্রদান করিলেন।··· হৈমবতী শ্বেতবর্ণ নব ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ ও নূতন দর্পণ গ্রহণ পূর্বক ক্ষীরোদ সাগরের ফেনপুঞ্জময়ী বেলাভূমি ও পূর্ণচন্দ্র বিমণ্ডিতা শারদ

রজনীর ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন…জননী মেনকা পীতবর্ণের হরিতাল ও রক্তবর্ণের মনঃশিলার তিলক পরাইয়া দিলেন।'

কালিদাস অলঙ্কারের কথা বলেননি, বলেছেন হরিভদ্র। তিনি বলেছেন, কনের অলঙ্কার হিসেবে সেকালে দেখা যেত জড়োয়া নেয়ূর, আংটি, কোমরবন্ধ বা চন্দ্রহার, নীবি পর্যন্ত লম্বা মুক্তোর মালা, নেকলেস, জড়োয়া কুণ্ডল ও টিকলি। এ হল হাজার বছর আগের কথা। তিনি নববধূব পোশাক হিসেবে লাল রঙের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে নববধূব পোশাক হচ্ছে রক্ত-লাল, তার ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ। ঊর্ধ্বাঙ্গে সাদা স্বচ্ছ দুকূলের উত্তরীয়, কারুর বুকে নয়ন-শোভন রঙের কোমল আঁচল। 'হর্ষচরিতে' বাণ লিখছেন, গ্রহবর্মা যখন দেখলেন রাজ্যশ্রীকে, নববধূবেশে, তখন 'অরুণাংশুকের গুণ্ঠনে মুখখানি তার ঢাকা, যেন প্রভাত সন্ধ্যা নিজের আলোয় ম্লান করে দিচ্ছে প্রদীপিকার গর্ব।' উমা যখন মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়েছিলেন, বসন্ত ও মদন তাঁর সহায়, তখন তাঁর সাজ কেমন ছিল কালিদাস সেকথা জানাতে ভোলেননি। উমার সর্বাঙ্গে ছিল ফুলের আভরণ ও আরক্ত বসন—

'অশোক-নির্ভৎসিত-পদ্মরাগমাকৃষ্ট-হেমদ্যুতি-কর্ণিকারম্।
মুক্তা-কলাপীকৃত-সিন্ধুবারং বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী॥
আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥
স্রস্তা নিতম্বাদলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশর-দাম-কাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ মৌর্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্মুকস্য॥'

লাল অশোক, হেমবর্ণের কর্ণিকার, মুক্তোর মতো সিন্ধুবার ফুলের আভরণ ছাড়াও বকুলমালার চন্দ্রহার পার্বতীর রূপকে শতগুণে বৃদ্ধি করেছিল।

নারীদের পুষ্পসজ্জার কথা আছে 'মেঘদূতে'ও। অলকার বধূদের হাতে লীলাকমল, কেশপাশে কুন্দ ফুল, মুখে লোধ্র পুষ্পের পরাগ, খোঁপায় নববিকশিত কুরুবক ফুল, দুই কানে দুটি শিরীষ ফুল আর সীমন্তে বিকশিত কদম ফুল—

> 'হস্তে লীলাকমলমলকে বাল কুন্দানুবিদ্ধং
> নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
> ছড়া পাশে নব কুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
> সীমন্তে চ ত্বদুপ্যামজং যত্রনীপং বধূনাম॥'

রাজশেখরের 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'তেও নারীর সুগন্ধি অনুলেপন ও সাজসজ্জার কথা আছে, যদিও রাজশেখর পরবর্তীকালের নাট্যকার। তিনি লিখেছেন—

> 'কণ্ঠে মৌক্তিকমালিকাঃ স্তনতটে কার্পূরমচ্ছং রজঃ
> সান্দ্রং চন্দনমঙ্গকে বলয়িতাঃ পাণ্যো মৃণালীলতাঃ।
> তন্বী নক্তমিয়ং চকাস্তি তনুনী চীনাংশুকে বিভ্রতী।'

গলায় মুক্তার মালা। স্তনতটে কর্পূরের পরাগ। সর্ব অঙ্গে চন্দনের ঘন প্রলেপ। হাতে মৃণাললতার বলয়, তনুতে সূক্ষ্ম চীনাংশুক।

প্রাচীনকালের নারীদের হাতে, গলায়, নাকে, কানে, কোমরে, পায়ে, মাথায় সর্বত্র নানারকম অলঙ্কারের ব্যবহাব ছিল। তবে সর্বত্রই সেগুলি বাহুল্যবর্জিত এবং শোভন। এঁরা শুধু মুক্তোর মালা পরতেন না, সূক্ষ্ম কাপড়ের প্রান্তে বসাতেন মুক্তোর সারি। তাকে বলা হত মণিচীর। এক ছড়া মুক্তোর মালাকে বলা হত একাবলী, অনেকেই একাধিক ছড়া মুক্তো পরতেন। শ্রীহর্ষ লিখেছেন, দময়ন্তীর কণ্ঠে ছিল বিশ ছড়া মুক্তোর মালা। সাত ছড়া, পাঁচ ছড়ার সংখ্যা প্রচুর। অজন্তার রানীর গলায় মুক্তোর মালা নিশ্চয় অনেকেই

দেখেছেন, প্রতিটি মুক্তোর ঔজ্জ্বল্য দু হাজার বছর পরেও মুগ্ধ করে দেয়! ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অলঙ্কারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'আবেধ্য' হচ্ছে কুণ্ডল প্রভৃতি কর্ণাভরণ; 'বন্ধনীয়' ভাগের মধ্যে পড়ে কটিসূত্র, অঙ্গদ, নূপুর প্রভৃতি; 'ক্ষেপ্য' হচ্ছে নূপুর ও বস্ত্রাভরণ; 'আরোপ্য' পর্যায়ে পড়ে স্বর্ণসূত্র ও নানারকম হার। আরো কয়েকরকম অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। যেমন, চূড়ামণি ও মুকুট শিরোভূষণ; মুক্তাবলী, হর্ষক ও সূত্র কণ্ঠের আভরণ; বটিকা এবং অঙ্গুলিমুদ্রা আঙুলের আভরণ; কেয়ূর ও অঙ্গদ ওপর হাতের; ত্রিসর এবং হার গলা ও স্তনের আভরণ; লম্বা মুক্তোর হার, মালা হচ্ছে দেহের আভরণ; তরল ও সূত্রক হচ্ছে কোমরের গয়না। এসব গয়না যে শুধু মেয়েরা ব্যবহার করতেন তা নয়, পুরুষরাও করতেন। এছাড়া দেবতা ও নারীদের জন্যে আরো ছিল — শিখাপাশ, শিখাজাল, খণ্ডপত্র, চূড়ামণি, মকরিকা, মুক্তাজাল, গবাক্ষি, কুণ্ডল, খড়্গপত্র, বেণীগুচ্ছ, দারক, ললাট-তিলক, কোমরের ওপরে ধারণীয় গুচ্ছ, নানারকম ফুলের অনুকরণ বা সোনার ফুল। মেয়েরা কানে পরতেন কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, অপেশ্রুক, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎপল, রত্নখচিত দন্তপত্র, কর্ণপুর। অলকা-তিলকা ও পত্রলেখাকে বলা হয়েছে গালের ভূষণ। এছাড়া ছিল ফুলের গয়না এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তার ব্যবহার যে খুব বেশি তা আমরা দেখেছি। অলঙ্কারের এত নাম দেখে মনে হয়, এদের নাম হত নকশা বা ডিজাইন অনুযায়ী। সেকালে মেয়েরা, সেকালে কেন একালেও কোন কোন অঞ্চলের মেয়েরা কানের উপরদিকেও গয়না পরেন, অনেকটা মাকড়ির মতো। আগে তার নাম ছিল কর্ণিকা বা তালপত্র। কুণ্ডল ছিল প্রাচীন আভরণ। কেউ কেউ আবার দু কানে দু'রকম গয়নাও পরতেন, যদিও তার সংখ্যা খুব কম ছিল।

একথা ঠিক, প্রাচীনযুগের সাজসজ্জা বা অলঙ্কারের বিস্তারিত বিবরণ কোথাও নেই, যা আছে সবই টুকরো টুকরোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবু ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় ভাস্কর্যের খণ্ড খণ্ড চিত্র ও মূর্তি থেকে আমরা নারীদের রূপচর্চার ও সাজসজ্জার একটি বিবরণ পাই। এই বিবরণ তৎকালীন সমাজ, জীবনদৃষ্টি এবং নরনারীর জীবনযাপন-রীতিকেও অনেকটা উন্মোচিত করেছে।

যতদূর মনে হয়, ভোগবাসনাকে অত্যধিক মর্যাদা দেবাব ফলে ভারতের একটি বিশেষ সময়ের সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে, জীবনচর্যায় সর্বত্র শরীর চেতনার ছাপ পড়েছিল। বাৎস্যায়নের কামসূত্র ছাড়াও তার অনুকরণে লেখা হচ্ছিল রতিরহস্য, রতিমঞ্জরী, স্মরদীপিকা, কামসমূহ, পঞ্চশায়ক, অনঙ্গরঙ্গের মতো অজস্র কামচর্চার গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে সেখানেও শৃঙ্গার রসের আধিক্য। অনেক সময় কাব্যের নিজের প্রয়োজনে নয়, সমকালীন পাঠকসমাজের রুচিব তাগিদেই সম্ভোগবর্ণনা, জলবিহার, মধুপানোৎসব প্রভৃতির বর্ণনা কাব্যে স্থান পেয়েছে। নরনারীর মিলনের স্থান হিসেবে যেমন শোনা যায় নগরোপবন, প্রমোদভবন, ধরাগৃহ, দোলাগৃহ, স্মরতভবন, দোলনাবিরোহন প্রভৃতি সাঙ্কেতিক নাম, তেমনি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে মিথুন মূর্তির ব্যবহারও লক্ষ্য করবার মতো। আয়নার হাতল, চিরুনি কিংবা জাঁতিতে থাকত মিথুন মূর্তি, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও চোখে পড়ে মন্দিরে মন্দিবে অজস্র মিথুন। বিচিত্র ভঙ্গিমার মিথুন মূর্তিগুলি আজও সারা বিশ্বের কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এই নিরবচ্ছিন্ন দেহসাধনার পর্বটি শুরু হয়েছিল অনেক আগেই, নবম শতাব্দী থেকে প্রায় পাঁচ শো বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাস্কর্যে এর প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে।

এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িয়ে ছিল নারীদের রূপচর্চা ও সাজসজ্জার প্রসঙ্গ।

আগেই বলেছি, প্রসাধন ও রূপচর্চার জন্যে প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত অবসরের। তৎকালীন সমাজে সাধারণ মানুষের জীবন যেভাবেই কাটুক না কেন, ধনী সম্প্রদায় ডুবে থাকতেন আকণ্ঠ বিলাসিতায়। সংযমের বালাই ছিল না তাঁদের জীবনে। এর জন্যে সামাজিক নিয়ম-কানুনও যে দায়ী ছিল না তা নয়, প্রথাগত বিবাহিত জীবনে অনেকের পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব হত না। সর্বত্রই বিবাহ হত কুলমর্যাদা ও জাতি-গোত্র বিচার করে। রাজপরিবারে বিবাহ অনেক সময় কূটনৈতিক চুক্তি বা সন্ধির প্রয়োজনে হত, নরনারীব পারস্পরিক আপত্তি বা অনুরাগ বিশেষ মর্যাদা পেত না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহিত জীবনে অতৃপ্তি থেকে যেত। তাছাড়া বহুবিবাহ যেমন অশাস্ত্রীয় ছিল না, তেমনি রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠীপুত্র প্রভৃতি ধনী সন্তানেরা যৌবনোদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গে পেত দাসী ও পরিচারিকাদের অবাধ সান্নিধ্য। ইচ্ছাবিলাস পুরুষদের নিয়ে যেতে পারত দাসী, সেবাদাসী, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী, সভানর্তকী, বারবিলাসিনী, এমনকি দেবদাসীদের কাছেও। একটি-মাত্র সুখের বৃত্তে বারবার ঘোরাফেরার জন্যেই এ পর্বের নারীদের সাজসজ্জা-প্রসাধন-অঙ্গরাগ-রূপচর্চা সর্বত্রই পারিপাট্যের ছাপ প্রকট। নিজেকে সুন্দর করে তোলাই শুধু নয়, নিজেকে কামনামদির করে তোলাই নারীদের রূপচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। দেহ তার নিজের অধিকারে সত্য এবং আবরণে-আভরণে এই দেহকে সাজানোর মুখ্য উদ্দেশ্যই তাকে সুন্দর করা, আকাঙ্ক্ষিত করে তোলা। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি কখনই প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া সাজপোশাক ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও সহায়ক।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। বোম্বাইয়ের প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামে মালবের 'ধার' অঞ্চল থেকে পাওয়া একটি শিলালেখ রয়েছে, সেটি রোডে লিখিত 'রাউল বেল', ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন, 'কবিতা-নামের অর্থ বড়লোকের বিনোদস্থলী।' আসলে শিলালেখটির বিষয় হল, মেয়ে বিক্রির হাটে ব্যবসায়ীরা নিজের নিজের পণ্য—স্বদেশের সাজ পরা তরুণীদের নিয়ে এসেছে ধনীগৃহে পরিচারিকা-ভোগ্যারূপে বিক্রি করবার জন্যে। তারা তাদের নিজের নিজের পণ্যের রূপ ও সাজসজ্জার বর্ণনা করছে। এখানে আছে সাতজন বক্তার কথা, তারা সাতটি দেশ থেকে এসেছে, কথাও বলছে সাতটি অঞ্চলের ভাষায়—গোল্ল (দাক্ষিণাত্য), কানোড় (কর্নাট), টেল্ল (গুজরাট), টক্কী (পাঞ্জাবী), গৌড়ী (বঙ্গ), মালবী (হিন্দী) ও সম্ভবত ব্রজভাখার মতো হিন্দীতে। এর ফলে হাজার বছর আগের সাজসজ্জার কিছুটা আভাস মেলে। প্রথম লোকটি বলেছে, তার দেশের মেয়ের চোখে কাজল, [কেশে] ছোটফুল, অধরে তাম্বুল, গলায় জালকাঁটি, পরনে রাঙা কাঁচুলি ও ঘাগরা। দ্বিতীয় লোকটি বলেছে, তার দেশের মেয়ের চুল সুন্দর করে [বেণী] বাঁধা, তার শেষে যুঁইফুলের থোপা, কানে ঢেড়ি [ঝুমকো], গলায় জালকাঁটি, কাছা দেওয়া অধোবাস, হাতে সরু উজ্জ্বল রক্ষাসূত্র, তাগা, পায়ে সুন্দর পাশুলি। তৃতীয় ব্যক্তি বলেছে, তার দেশের মেয়ের চোখে সামান্য কাজল, কানে মদনের সাজির মতো ঝুমকো, গলায় পুঁতির হার, লম্বা রাঙা কাঁচুলি, [ওপরের] হাতে মালা জড়িয়েছে, হাতে রতনচুড়, অঙ্গে স্বচ্ছ কাপড়, পায়ে নূপুর। চতুর্থ ব্যক্তি বলেছে, তার দেশের মেয়ে এমন খোঁপা বেঁধেছে, দেখে মনে হচ্ছে 'গৌরী আলিঙ্গিত শিব!' চাঁদের মতো টিপ, চোখে কাজলের ছোঁয়া। কানে

ঝুমকো, কণ্ঠে জালকাঁটি, পরনে ফাঁদালো ঘাগরার সঙ্গে দোরঙা ছোট কাঁচুলি। পঞ্চম ব্যক্তি বলেছে, তার দেশের মেয়ের চুড়ো-বাঁধা খোঁপা, তাতে ছোট ছোট তারার মতো ফুল, কপালে গোল টিপ, কানে তালপাতার গয়না, গলায় পাঁচনর হার, মুক্তোর চেয়েও সুন্দর সোনার দানার মালা, গেঁটে সুতলি হার, দুই স্তনের মাঝে সুতলি হার, বাহুতে তাবিজ, পাতলা শাড়ি কটিতে জড়িয়ে পরা, ধবল ওড়না। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলেছে, তার দেশের মেয়ের কেশ দু ভাগ করে বাঁধা, কপালে টিপ, চোখে কাজল, কানে কানপাশা, পরনে 'ধড়িবন' (চুমকির কাজ করা কাপড় ?), গলায় একাবলী হার, হাতে-পায়ে সোনার চূড়। সপ্তম ব্যক্তি বলেছে, তার দেশের মেয়ের পরনে 'নিরী', গলায় একাবলী। ফর্সা মেয়ে পরে লাল কাপড়, শ্যামলী পরে পাটল রঙের। প্রত্যেকেরই বক্তব্য, বড়মানুষের ঘরে এমন মেয়েই মানায়। বর্ণনাগুলো সম্পূর্ণ নয়, সবটা পড়া যায়নি। ডঃ সেন পাঠ্য অংশের যথাযথ অনুবাদ করেছেন, কোন কোন শব্দের অর্থ বোঝা যায়নি। এখানে অবশ্য শুধু নারীদের সাজের বৈচিত্র্যের কথা বলা হল, বক্তারা তাদের দেশের মেয়েদের রূপ-যৌবনের কথাও বলেছে, এখানে সে প্রসঙ্গ বাহুল্য, প্রাচীনকালেও যে সাজসজ্জাকে কামনা কিংবা বলা চলে সৌন্দর্য বিকাশের সহায়ক ভাবা হত, এই বর্ণনাগুলি তার প্রমাণ। ভাবে মনে হয়, রূপের হাটে বিক্রি হতে আসা মেয়েগুলির রূপ-যৌবন মোটামুটি একই ধরনের — সাজপোশাক দিয়েই তাদের আলাদা করে দেখাবার চেষ্টা করেছে বিক্রেতারা, এটি তৎকালীন সমাজের রুচি ও প্রবণতারও দলিল। মানুষ আগে 'দর্শনধারী' সেকথা মনে রাখতে হবে। তার সস্মিত উপস্থিতিই বুঝিয়ে দেবে তার ব্যক্তিত্বকে এবং সাজপোশাকের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম ফুটে উঠবে তার রুচিবোধ।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাজসজ্জায় এদিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

যদিও নান্দনিক দৃষ্টিতে এই সাজসজ্জার মধ্যে কোন খুঁত পাওয়া যাবে না, ভারত-ভাস্কর্যেও সেজন্যে চোখে পড়ে অগণিত লাস্যময়ী নারীর অপরূপ মূর্তি। প্রাচীন ভারতীয়দের সাজসজ্জার অনেকটা আভাস এই শালভঞ্জিকা, সুরসুন্দরী, অলসকন্যা, অপ্সরা, যক্ষিণী, নায়িকা, মদনিকাদের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রদীপ্ত বাসনার শিখা হয়ে এই অনন্তযৌবনারা শুধু আকাঙ্ক্ষার স্বর্গে বন্দিনী হয়ে নয়, একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রবণতার প্রতীক হয়েও এ যুগের মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে। সে অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমাদের কাছে এই ভাস্কর্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মতোই একটি প্রয়োজনীয় দিক, যার সাহায্যে আমরা তৎকালীন নারীদের সাজসজ্জা সম্বন্ধে অবহিত হই।

এবার আসা যাক মুসলমান শাসকদের সমকালীন ভারতবর্ষে। আমরা সাধারণত যাকে বলি মধ্যযুগ। প্রাচীনযুগের নিঃশেষ সমাপ্তির পরেই মধ্যযুগের শুরু, তা নয়। কোন বিশেষ রীতি-রেওয়াজ এভাবে শুরু বা শেষ হয় না, বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে। এখানে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য বড় বেশি। নতুন রীতিনীতিকে যত সহজে গ্রহণ করা হয়, পুরনো রীতিকে তত সহজে বর্জন করা হয় না, অর্থাৎ এখানে থেকেই যায় সব কিছু। সেজন্যেই অজন্তার গুহাচিত্রে আমরা দেখেছি বিভিন্ন ধরনের সাজপোশাকের একত্র সমাবেশ। এই মধ্যযুগেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। সাধারণত সব দেশেই বিজিত বিজয়ীর অনুকরণ করে।

শোনা যায়, আর্য নারীদের উন্মুক্ত বক্ষ দেখে দ্রাবিড় নারীরা লজ্জায় লুকিয়ে ফেলেছিলেন তাঁদের কঞ্চুলিকা। সব দেশেই দেশের রাজা-রানীব সাজসজ্জার অনুকরণ করেন অভিজাত সমাজ, অভিজাতদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষ। বহুদিনের ব্যবধানে সবাইকে এক সময়ের বলে মনে হয়। ভারতে আসা লুণ্ঠনকারী বিদেশী রাজারা যখন এদেশেই শাসক হয়ে বসলেন তখন তাঁরাও বর্ণাঢ্য ভারতীয় সাজসজ্জা দেখে মুগ্ধ হলেন। মুসলমান শাসকরা ভারতে আসার আগেই চীন ও পারস্যের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং ঐ দুটি দেশের বস্ত্রশিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল বহু পূর্বেই। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে মুসলমান শাসকরা যে পোশাক পরতেন তা সাদাসিধে, ঘোর রঙের এবং মোটা সুতি বস্ত্রের। তাতে না ছিল নকশা, না ছিল রঙ। এই পোশাক অবশ্যই যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী ছিল। মেয়েরাও পরতেন একরঙা পেশওয়াজ ও পাজামা। ভারতে এসে রাজস্থানের মেয়েদের মতো তাঁরাও ওড়নার ব্যবহার শুরু করলেন। প্রথমে এই ওড়না বা দোপাট্টা আকারে খুব ছোট ছিল, পরে ক্রমশই বড় হয়েছে। এই ওড়নার ক্রমবিবর্তনই বোধহয় ভারতীয় পোশাকের জগতে সবচেয়ে বড় বিস্ময়। এ প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তার আগে হারেমের কথায় আসি। মুসলমানেরা রাজ অন্তঃপুরকে বলতেন হারেম; যতদূর মনে হয়, হারেমে কড়াকড়ি বা পাহারা দেবার কঠোর ব্যবস্থার চল্ ছিল। হিন্দু রাজাদের সময় রানী বা পুরাঙ্গনারা সত্যিই সম্পূর্ণভাবে অন্তরালবাসিনী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে রাজপুত রাজাদের অন্তঃপুর বা রাওলার পর্দা এবং কড়াকড়ি মুঘল হারেমের মতোই ছিল সন্দেহ নেই। এই ব্যবস্থা বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে নারীদের রক্ষা করবার জন্যে রাজারা নিজেরাই

নিয়ম করেন, না, শাসকদের রীতি-রেওয়াজের অনুকরণে অন্তঃপুরে পর্দার চল হয়, তাও গবেষণার বিষয়। তবে আমরা দেখেছি, মুঘল হারেমে রাজপুত রাজকন্যারা আসতেন বেগম হয়ে—ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে। হারেমের প্রাঙ্গণে তুলসীগাছ রোপণের ব্যবস্থা দেখে বোঝা যায় তাঁরা নিজের নিজের ধর্মাচরণে যেমন বাধা পাননি তেমনি বাধা পাননি নিজস্ব সংস্কৃতির অনুশীলনে। হারেমে তাঁরা এনেছিলেন রাওলার রঙ ও ঔজ্জ্বল্য। নিশ্চয় তাঁদের বর্ণাঢ্য ঘাগরা কাঁচুলি ওড়না মুগ্ধ করেছিল একরঙা পেশওয়াজ ও পাজামা পরা বেগমদের। লোকে বলে, রাজস্থানের প্রকৃতি এত রুক্ষ বলে রাজপুতানীর অঙ্গে এত রঙ। যাদের দেশের প্রকৃতি হরিৎ-শ্যামল, ফুলে-ফলে রঙিন, সে দেশের মেয়েরা পরে সাদা শাড়ি। এখনও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে রাজস্থানে রঙের ব্যবহার বেশি। তবে এখন আর কোন রাজ্যই পিছিয়ে নেই। যাক সে কথা।

রাজপুত রাজাদের পোশাকের মধ্যে কোমরবন্ধ বা পটকার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বাদশাহ এবং শাহজাদারা। এবং তাঁরাও রাজপুতদের দেখাদেখি সূক্ষ্ম জরির কাজ করা পটকা ব্যবহার করতে শুরু করলেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে রকমারি নকশার কোমরবন্ধ পাওয়া গেছে। এই পটকা রাজপুত মেয়েরাও ব্যবহার করতেন ঘাগরার সঙ্গে। পটকা শুধু যে বেল্টের কাজ করত তা নয়, তাঁদের কোমরটিকেও সরু রাখতে সাহায্য করত।

মুসলিম সমাজে প্রথমদিকে চিত্রিত পোশাক পরার ধর্মীয় নিষেধ ছিল। তাঁরা ছবি আঁকতেন না কোন জীবিত বস্তু বা ব্যক্তির। সেজন্যে কোরানের হরফগুলি সুন্দর করে চিত্রিত করা হত, বোনাও হত। অপরদিকে চীনে ছিল কাপড়ের ওপর সুতো বা জরি দিয়ে

ছবি আঁকার চল্। এছাড়া ছিল নানারকমের ডোরা দেওয়া কাপড়। পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষেরা ডোরা দেওয়া কাপড়ের জামা কিংবা পাজামা তৈরি করতেন, পাগড়ি জাতীয় শিরস্ত্রাণও তৈরি করতেন। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে সব জিনিসেরই প্রচলন ছিল—ডোরা, নকশা, ছবি, অলঙ্কারের মতো জড়োয়া সোনা-রুপোর ফুল বসানো ছাড়াও এঁদের ঝোঁক ছিল বস্ত্রের সূক্ষ্মতার ওপর। ভারতের উষ্ণ আবহাওয়ার জন্যেও ভারতীয়রা পাতলা কাপড় পছন্দ করতেন। নতুন যে কোন জিনিসকে পরম সমাদরে গ্রহণ করার মতো উদার মন ও সুন্দরকে চিনে নেবার মতো শিল্পসম্মত দৃষ্টিও ভারতীয় নারীর সাজসজ্জাকে উন্নততর করতে বহুলাংশে সাহায্য করেছে।

মুঘল আমলের আগে এবং পরে সাধারণভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বেগমদের পোশাকে ডোরা কাটা সিল্ক ও মসলিনের প্রাধান্য চোখে পড়ে। পুরনো আমলের আঁকা ছবিতে দেখা যায় হারেমের মেয়েরা পরেছেন সাদা পাজামা ও আঁটসাট কুর্তা। এই কুর্তার নিচের দিকটা আধুনিক কামিজের মতো সমান নয়—চারটা বা ছ'টা কোণ থাকত তাতে,অনেকটা ত্রিভুজের মতো দেখাত সেগুলি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ পোশাক ছিল সাধারণ মেয়েদের পোশাক। ছবিতে আছে পরিচারিকা এইরকম কুর্তা পরে সুরা পরিবেশন করছে। ভৃত্যদের পোশাকেও এই কোণ চোখে পড়ে। রাজস্থানেও দুর্লভ নয়। যতদূর মনে হয়, এ পোশাকটিতে ভারতীয় রীতির সঙ্গে পারসীক রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। কুর্তার এই কোণের সঙ্গে দেখা যায় ভি-এর মত গলা, এবং সেখানে জরি বা সামান্য সুতোর কাজ। মুসলমান শাসকদের পোশাকে বহুদিন পর্যন্ত কোন নকশা ছিল না। বেগমদের পোশাকে পরিবর্তন এল দ্রুতভাবে। এবং এ সময় থেকেই বস্ত্রশিল্পের, বিশেষ

করে কিংখাবের প্রভূত উন্নতি দেখা দিল। সেই খানদানী ব্যাপার আজও চলে আসছে বেনারসীর জগতে। সেখানে এখনও তসবীর, লহরিয়া, চারখানা, খানজুরি, ডোরিয়া, সালাইদার, মোটরা, ইলায়েচা, সঙ্গী, বুলবুলচশম, চশমানকশা, আড়িবেল, খাজুরিবেল, পানবুটি, ফুলবুটি, কলগাবুটা, শিকারগাহ, গুলদাউদি, চিনিয়াপট মখমলী, বুটি মানাতাশি, জামেয়ার বুটি, ফর্দি বুটি, পাংখা বুটি, আসরফি বুটি, জালি কী তুরঞ্চ বুটি, বুটা ঝাড়দার, মেহরাব, তনছই, ভাসকট, আড়াগুজর, গুলবদন, বেলদার, কাঙ্গুরী, ফুলোয়ার প্রভৃতি নামের ছড়াছড়ি। এই নামগুলো মনে পড়িয়ে দেয় বেনারসী শিল্পের বিশেষ একটা জগৎকে। সে জগৎটা শুধু নকশার জগৎ নয়, বস্ত্রশিল্লেব প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদেরও জগৎ। সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দুজনেই ছিলেন শিল্পপ্রেমিক। নূরজাহান নিজেই ছিলেন শিল্পী। সূক্ষ্ম কারুকাজ করতে পাবতেন কাপড়েব ওপব। অনেক নকশা নাকি তাঁরই আবিষ্কার।

আসলে নূরজাহান ভারতীয় নারীর পোশাকে এনেছিলেন নতুনত্ব। অবশ্য তিনি হারেমে পারসী প্রভাবটিকে পুরোমাত্রায় বজায় রাখতে চেয়েছেন ; তবে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। প্রথমদিকে হারেমের মেয়েরা কিংখাব ব্যবহার করতেন না। একরঙা বা ডোরাকাটা জামা ও পাজামার ওপরে তাঁরা পরতেন মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম মসলিনের পেশওয়াজ। কিংখাব জিনিসটা নারীদের পোশাকের উপকরণ হিসেবেও ছিল বেমানান। ভারী এবং জরির কাজের জন্য কিছুটা কর্কশ। এছাড়া ভারতীয় মেয়েরা পরতেন গা-ভর্তি সোনা-রুপোর অলঙ্কার। তাঁদের পোশাকেও সোনার ফুল রুপোর পাতার বাহারের প্রয়োজন কী! দুইয়ে মিলে রূপ খোলে না, গয়না-পোশাক

দুই-ই মাঠে মারা যায়। তাই কিংখাবের অঙ্গরাখা পরতেন পুরুষেরা। মুঘল সম্রাটেরা—জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব তিন জনেই ছিলেন কিংখাবের সমঝদার। ঔরঙ্গজেব পছন্দ করতেন নানা ধরনের মসলিন, বিশেষ করে কাজকরা জামদানী মসলিন। আবরোঁয়া নয়নসুখ ও জামদানীও এ সময়েই উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। চিকন কাপড়েও দেখা গিয়েছিল নানা বৈচিত্র্য। ভারতীয় নারীদের মধ্যে জুতো পরার চল্ খুব বেশি ছিল না। যদিও বেলুড়ের দু-একটি মদনিকার পায়ে দেখা গেছে হাই-হিল হাওয়াই চটির মতো পাদুকা। হারেমবাসিনীরা সকলেই জুতো পরতেন, সামনেটা কারুকাজ করা ঢাকা, পিছনে কারুর ঢাকা কারুর বা চটির মতো খোলা। এঁদের জুতোর কারুকাজ করা অংশে কিংখাবের ব্যবহার শুরু হল। পারসীক নারীরা ওড়না ব্যবহার করতেন কিনা জানা যায়নি। হয়ত রুমালের মতো ছোট ওড়নার ব্যবহার তাঁরা জানতেন, তার পরিবর্তে তাঁদের মাথায় উঠল টুপি। ভারতীয় নারীরা টুপি পরতেন না, মুকুট পরতেন রানীরা। মুসলমান সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েরই টুপি পরার চল্ ছিল। বেগমদের টুপিও তৈরি হত মহার্ঘ জরির ফুলদার কিংখাব দিয়ে, তাতে বসানো হত দামী জহরৎ ও মুক্তো। মুঘল হারেমে টুপির ওপরে বাঁদিকে বোতাম বসানো হত।

ভারতে এসে মুঘল অন্তঃপুরের নারীরা দেখলেন কাঁচুলি, ঘাগরা ও ওড়না পরা সুবেশা রাজপুতানীদের। তাঁরা মুগ্ধ হলেন এই পোশাকটির সুন্দর সাবলীলতায়। প্রথমে রাজপুতানীদের, বিশেষ করে কাংড়া অঞ্চলের মেয়েদের পটকা এবং পরে তাঁদের কাঁচুলি ও ওড়নাটিও হারেমবাসিনীরা গ্রহণ করলেন। নূরজাহানের ছবিতে দেখি তাঁর পরনে ডোরাকাটা পাজামার ওপর হ্রস্ব জামা, যা কাঁচুলি

ও কুর্তার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এবং মসলিনের পেশওয়াজ। হারেমবাসিনী যেমন টুপি বা তাজ পরতেন, সেটি গ্রহণ করেছিলেন রাজস্থানের কোন কোন রাওলার নারীরা। বুঁদীর রাজকন্যারা লম্বা টুপি পরতেন।

শিল্পানুরাগিণী নূরজাহান অনেকগুলি কাপড় ও নকশার আবিষ্কর্ত্রী। তিনি একে একে প্রবর্তন করেন পাঁচতোলিয়া ওড়না, দুদামী পেশওয়াজ, বাদলা বা এক ধরনের কমদামী জরি, কিনারি বা লেস, আতর ই জাহাঙ্গিরী, নূরমহালী কিংখাব; আরো কত কী। নূরজাহান পোশাকের ওপর সূক্ষ্ম কাজ পছন্দ করতেন। অনেকের মতে চিকনের নকশাও তাঁরই আবিষ্কার। তা যদি না-ও হয়, তিনিই যে এ শিল্পটির প্রভূত উন্নতি করেন তাতে সন্দেহ নেই। বেগমদের বিয়ের সাজ তৈরি হত জমকালো কিংখাব দিয়ে। নূরজাহান স্থির করলেন, বিয়ের সময় সকলেই জমকালো জরির পোশাক পরবে। আহা গরীবদেরও তো ইচ্ছে করে একদিনের জন্যে বাদশা-বেগম হতে! সেই একদিনটি তাদের জীবনে আর কবে হতে পারে বিয়ের দিনটি ছাড়া! সম্রাজ্ঞীর খেয়াল! তাঁর কোন অভাব নেই, কিন্তু তাঁর দাসীরা? প্রতিদিন যারা তাঁকে সাজিয়ে দিচ্ছে, তারা সাজবে না! কিন্তু কিংখাবের পোশাক বড় দামী। গরীবরা পরবে কি করে? ভেবেচিন্তে নূরজাহান নিজেই একটা নকশা তৈরি করে ফেললেন। ফাঁকার ওপর জমকালো। যে সব নকশা খুব সূক্ষ্ম নয়, অথচ পুরো জমিটা ভরে থাকে, তাকে বলা হয় ফাঁকার কাজ। নূরজাহানের পরিকল্পনামতো এ কাপড় বুনতে সময় কম লাগে, দেখতে ঝলমলে হলেও পরিশ্রম কম বলে দামও কম। এই নতুন জরির পোশাকের নাম দেওয়া হল নূরমহালী। নূরজাহান নিজের পরিচারিকা ও তাদের কন্যাদের

বিয়েতে উপহার দিতেন নূরমহালী পোশাক। তৈরি করতে তখনকার দিনে খরচ পড়ত পঁচিশ টাকা, মতান্তরে পঁচিশ মোহর বা একশো টাকা। আজও এ রীতি আমাদের দেশে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পালিত হচ্ছে। অর্থাৎ নূরজাহানের এই সঙ্কল্প ভারতীয় নারীর পোশাকে নিয়ে এল নতুন দিগন্ত। ইতিপূর্বে বিয়ের সাজ বলে আলাদা কিছু ছিল না। রাজ্যশ্রীর বিয়ের বড় মাপের আয়োজনের কথা বাণভট্ট লিখেছেন কিন্তু সেই সাজপোশাকের স্তূপ থেকে রাজ্যশ্রীর রক্তিম পট্টবস্ত্রটিকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়নি, বরং ভারতীয় সনাতন রীতি অনুযায়ী বিয়ের সাজ ছিল সাদা এবং সেখানে ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তে পবিত্র ও সুন্দরেরই প্রাধান্য ছিল। মধ্যযুগের সাজের ক্ষেত্রে একটা বড়-রকমের পরিবর্তন ঘটালেন নূরজাহান।

এরপর থেকে বিয়ের কনের সাজ মানেই জমকালো জড়োয়ার প্রাচুর্য। এ প্রসঙ্গে অভিজাত মুসলমান মেয়েরা বিয়ের সাজে কেমন সাজতেন তার একটা নিখুঁত বিবরণ আন্না হ্যারিয়েট লিউনাউসের বর্ণনা থেকে নেওয়া যাক। আন্না ভারতে এসেছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি। তখন খানদানী পরিবারের সাবেকী ধারা পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে। লিউনাউসের নিজের ভাষায়,

'...she wore a purple silk petticoat embroidered with a rich border of scattered bunches of flowers, each flower formed of various gems, while the lines and stems were of embroidered gold and silk threads. The bodice was of the same meterial as the petticoat, the entire vest being marked with circular rows of pearls and rubies. Hair was parted in the

Greek style and confined at the back in a graceful knot bound by a fillet of a gold. On her forehead rested a beautiful flashing star of diamonds. Her slippers, adorned with gold and seed pearls, were open at the heads showing her henna-tinted feet and curved up in front towards the instep, while from her head flowed a delicate kincauli scarf woven from gold thread, of the finest texture and of a transperant, sunbeam like appearance. This was draped round her person and concealed her eyes and nose revealing only the mouth and chin....'

নারীসুলভ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে লেখিকা বধূটির সাজ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এর মধ্যে সবার আগে যা চোখে পড়ে তা হল জাঁকজমকের প্রাচুর্য। মুঘলযুগের আড়ম্বর যেন পরবর্তীকালের নারীদের সাজসজ্জাকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছে। একই সঙ্গে সব কিছুকে সোনাদানা, রঙ, কারুকাজ দিয়ে ভরিয়ে দেবার এই প্রবণতা হিন্দুযুগে ছিল না। নববধূটির বেগনে-লাল ঘাগরা, লেখিকা যাকে পেটিকোট বলেছেন, ও কুর্তা বা কাঁচুলিতে জরির সঙ্গে জড়োয়া পাথর বসানো হয়েছে, কাঁচুলিতে মুক্তোর সারি, চুলে, কপালে, এমনকি জুতোতেও রয়েছে সোনা এবং এদের ওপর স্বচ্ছ সোনা রঙের ওড়না—সব মিলে যা সৃষ্টি করছে তাতে নেই একটুও অবসর। অথচ কোন কিছুর অভাব চোখে পড়বে না, এবং সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সৌন্দর্য নির্ণয়ের পথে প্রধান অন্তরায়।

বস্তুত এরপর থেকেই নারীর সাজসজ্জায় প্রাচুর্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যতদূর মনে হয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী কিছুটা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করেছিলেন এ সময় থেকে। একই সঙ্গে স্বামীকে সপত্নীদের হাত থেকে রক্ষা করে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবার বাসনাও প্রবল হয়ে ওঠে। বস্তুত, নারীসমাজের এ অবস্থা যে হিন্দুযুগেও ছিল না তা নয়, কিন্তু হারেম-সংস্কৃতিতে এর বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে। তাছাড়া মুঘলরা সকলেই ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয়। তাঁদের সাজসজ্জার আড়ম্বর তৎকালীন অভিজাত সমাজে গৃহীত হল ফ্যাশান হিসেবে। সর্বপ্রথম প্রভাবিত হলেন রাজপুত নারীরা, পরে গুজরাট ও অন্যান্য সব অঞ্চলে।

মুঘল আমলে আড়ম্বরের মধ্যেও নারীর সাজকে রুচিসম্মত করে তুলতে নূরজাহান চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর সময়কার সাজে-প্রসাধনে অলঙ্কার হিসেবে গৃহীত হয়নি কোন ফুল কিংবা কচি পাতা, আধফোটা ফুলের কুঁড়ি বা পদ্মের মৃণাল। তার বদলে তাঁরা ব্যবহার করতেন সোনার ফুল, হীরের ফুল, দামী পাথর বসানো রুপোর ফুল, জরির ফুল। তবে মুঘলরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন রাজপুত রাজা ও রাজকন্যাদের সাজপোশাকে। এই পোশাকের অনুকরণ অব্যাহত ছিল সর্বক্ষণই। কাংড়ার মেয়েরা পরতেন লম্বা চোলি, তার আস্তিনটা কবজি ছুঁতো। এটিও মুঘল অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। এছাড়া সেখানে এল আর-এক ধরনের জামা, তার নাম জাঙ্গুলি—লম্বায় হাঁটু পর্যন্ত, সামনে-পিছনে হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি। জামাকাপড়ে জহরৎ বসানোর চল শুরু করেন জাহাঙ্গীর, তার আগে মুসলমান শাসক বা আমীর ওমরাহরা জামায় হীরে-মুক্তো বসাতেন না, নিজেরাও গয়না পরতেন না। কিন্তু

রাজপুত রাজারা পরছেন, কতদিন আর গয়না না পরে থাকা যায়! মেয়েদের গয়না-প্রীতির অনেক গল্প শোনা যায়। প্রায়ই সে সব গল্পে লোভ শোভনতার সীমা অতিক্রম করে। কিন্তু ভারতীয় পুরুষেরাও গয়না পরতে কম ভালবাসতেন না। বেশবাস সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলেই জাহাঙ্গীর একদিন কান বিঁধিয়ে ফেলে দু'কানে দুটি উজ্জ্বল মুক্তো পরে ফেললেন। শোনা যায় হিন্দুরা কান বিঁধিয়ে গয়না পরত, কারণ তাদের ধারণায় কান বেঁধালে চোখ ভাল থাকে তাই। এরকম হাস্যকর ধারণার কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। জাহাঙ্গীর শখ করেই কানে গয়না পরলেন এবং তাঁর দেখাদেখি আমীর ওমরাহরাও কানে গয়না পরা শুরু করলেন।

মধ্যযুগে গয়নাগাটির চল ছিল ভালমতোই এবং আগেই বলেছি এই পর্বে ছিল সোনা-রুপো হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি। হিন্দুযুগের সেই শুচিস্মিত লাবণ্যে পূর্ণ তনুটিকে পুষ্পাভরণে সাজাবার প্রবণতা এযুগে অন্তর্হিত। এ পর্বে ভাস্কর্যের উদাহরণ নেই, আছে চিত্র। এসব ছবিতে আমরা দেখতে পাই হারেম কন্যাদের নানারকম সাজ। ডোরাকাটা বা ছাপা কাপড়ের আঁট পাজামা, তার ওপরে মসলিনের অঙ্গাবরণ ও ওড়না প্রায় সকলকেই ঘিরে রয়েছে। অনেক সময় মনে হয় আঁটসাঁট পাজামার ওপরে তাঁরা পরতেন মসলিনের স্বচ্ছ ঘাগরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা লম্বা হাতাওয়ালা চোলি পরতেন। এছাড়া সর্বাঙ্গে থাকত অজস্র গয়না। মুঘল আমলে অজস্র নতুন ধরনের গয়না এসেছিল। তার কোনটি ছিল পুরনো গয়নার নতুন সংস্করণ কোনটি বা সম্পূর্ণ নতুন। পারসীরা অলঙ্কারের ওপর মিনার কাজ করতে পারতেন। তাঁদের স্থাপত্যেও রয়েছে নয়নাভিরাম মিনাকারী। কুন্দন-মিনাকারী আজও প্রসিদ্ধ।

মুঘল অলঙ্কারেব মধ্যে তাজ ও ঝাপটা এসেছিল নতুন করে। হিন্দুযুগে এ দুটি মেয়েদেব শিরোভূষণ ছিল না, ছিল না টায়রা কিংবা টিকলি, তবে মাথায় ফুল ও ফুলের মালার ব্যবহার ছিল, সিঁথিতে ফুল পরাও চলত, নববধূর সিঁথিমৌর এল পরবর্তীকালে টায়রা ও টিকলির যোগফল হিসেবে। যতদূর মনে হয় টায়রা এসেছিল সমুদ্র পার হয়ে, বিদেশিনীদেব অলঙ্কার হিসেবে। এ প্রসঙ্গে অতীতের টায়ার রাজ্যের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। তারপর তাকে ভারতীয় করে নেওয়া হয়েছে। মেয়েবা মাথায় পরতে শুরু করলেন চৌঙ্ক, শিসফুল, ছোটি, মৌলি। কপালে পরতেন দম্‌নি, কুটবি, তাওইট, চাঁদটিকা, ঝুমর, গুছই, বারওয়াট ও বিন্দলি। এগুলো সবই কপাল অলঙ্করণের অলঙ্কার। প্রাচীন ভারতীয় সাজসজ্জায় এসব একেবারেই ছিল না। নারীরা সাজতেন টিপ ও অলকাতিলকায়। মুসলমান সমাজে টিপ বা চন্দন-কস্তুরী পরার চল্‌ ছিল না, অবশ্য তাঁরা হাত-পা এবং নখ রাঙাতেন মেহেদী বা হেনা দিয়ে এবং সেটা শিখেছিলেন রাজপুত-ললনাদের কাছ থেকে। মুখে ব্যবহার করতেন নানাবকম ধাতব অলঙ্কার—এগুলি সবই টিপ, টিকলি প্রভৃতির সমগোত্রীয়।

এ তো গেল মাথার অলঙ্কার। কানেও উঠল নানারকম গয়না! যদিও ভারতে কর্ণাভরণের অভাব ছিল না, কাশীর মণিকর্ণিকা প্রাচীনকাল থেকে পার্বতীর কর্ণাভরণের স্মৃতি বহন করছে। মুঘল অলঙ্কারে দেখা গেল আরো কয়েকটি নতুন নাম—গোসওয়াড়া, বাহাদুরি, ঝমকা, বালা, খুংরিদার, মছলিয়ান, পতং, তানছুর এবং মোর ফুলওয়ার। এসব অলঙ্কার কিছুটা নাম পালটে কিংবা সামান্য রূপ বদল করে বিশ শতকের গোড়াতেও দেখা গেছে। বাঙালীদের মধ্যে মদনকড়ি

ও বীরবৌলী নামের দুটি কর্ণাভরণের কথা শোনা যায়। এছাড়া কানবালা, কানপাশা, কান—এ সবেতেই মুঘল প্রভাব প্রত্যক্ষ।

নাকের অলঙ্কার হিসেবে নতুনভাবে পাওয়া গেল নথ, বুলক, লটকান, লং, নোলক প্রভৃতি। প্রাচীন ভারতে এগুলির কোনটাই ছিল না। পরবর্তীকালে নথ ও নোলক হয়ে দাঁড়ায় আয়তির চিহ্ন। ফাঁদি নথ এতবড় আকারের হত যে তার ভেতর দিয়ে অনায়াসে ভাত খাওয়া যেত, গ্রাস তোলবার সময় নথটিকে টানা দিয়ে আটকে রাখতে হত না। বলা বাহুল্য এ অলঙ্কার পরবর্তীকালের। মুঘল হারেমের ছবিতে এত বিশাল নথ চোখে পড়ে না। নথ সবাই যে পরতেন তা নয়, নবাবী আমলে স্বামীর সম্মান অনুযায়ী স্ত্রীর নথ পরবার অধিকার জন্মাত। শ্রীহট্টের গৌররাম রৈ সম্পন্ন বারুজীবী, আপন স্ত্রী-কন্যাকে নথ পরাবার জন্যে অনুমতি চেয়েছিলেন আঠারো শো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। তারপর ১১৫৬ সালের ২২ আষাঢ় তিনি পেলেন বহু ইপ্সিত প্রার্থনার উত্তর—তাঁর বাড়ির মেয়েদের পুরুষানুক্রমে নথ পরবার অনুমতি দেওয়া হয়। এসব উদাহরণ দেখে মনে হয়, অলঙ্কার ধারণের ওপর নানারকম বিধিনিষেধ উচ্চবর্ণের সম্প্রদায়ের জন্য না হলেও শ্রমিক সমাজের জন্য প্রচলিত ছিল। রাজপরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউ পায়ে সোনার নূপুর বা অন্য গয়না পরতে পারতেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তিন কন্যার বিবাহ হয় রাজপরিবারে—তাঁরা যখন সোনার নূপুর পরে বসতেন তখন তাঁদের, বিশেষ করে তাঁদের নূপুর পরা পা দুখানি দেখবার জন্যে মেয়েরা ভিড় করত। মুকুট পরা সম্বন্ধেও এ ধরনের বিধি-নিষেধ ছিল। এ নিয়ম ছিল বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারীর অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও, কোথাও মঙ্গলসূত্র, কোথাও টিকলি, কোথাও নোলক বা নাকছাবি—সধবার চিহ্ন।

আঠারো শো শতকের বঙ্গদেশেই কতরকমের নাকের গয়না পাওয়া যেত জানতে ইচ্ছে হলে মঙ্গলকাব্যের পাতায় উঁকি মেরে দেখতে হবে। মেয়ে বাপের বাড়ি এসে পুরনো গয়না ভেঙে নতুন গয়না গড়াতেন। দুর্গাও কৈলাসে এসে নথ ভেঙে নাকচনা গড়াচ্ছেন এ দৃশ্য দুর্লভ নয়। এদের নামও নানারকম—মাক্কি, বেশর, পিপলিপাত, ডাইলিবালি, চমকিবালি, ঝিলকিবালি, আন্নিবালি, চুন্নিবালি, ডালবোলাক, চানবোলাক, হীরাকাট বোলাক। নাকছাবিও ছিল নানারকম—ডালিমফুল, লবঙ্গ, বড়ইফুল, চালতাফুল, দামালকাট—সবই নকশা অনুযায়ী নাম। এই আমলে দাঁতের অলঙ্কার হিসেবে রখন অভিনবত্ব এনেছিল। সোনা বাঁধানো দাঁতের চল্ ছিল একসময়।

গলায় হার, মালা, লহর বা মুক্তোর ছড়া পরার চল্ ছিল হিন্দু আমলে। অল্পবিস্তর সব ভারত-ললনাই কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করতেন। নতুন নামকরণ হলেও চম্পাকলি, হাঁসুলি, ইতরাদন, গুলবন্ধ, কান্দি, মোহরণ, হাউলদিল সবই ছিল আগে থেকেই। মুঘল হারেমে আঁটসাঁট গলাবন্ধ জামা পরার চল্ ছিল, সেখানে সুযোগ ছিল না বিশেষ হার পরার, তবু মুক্তোর মালা, চিক ও গুলবন্ধের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হাতের গয়না সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বাজুবন্ধ, জোঁসান, তাবিজ, অনন্ত, বাউটি, ভাওটা, জশমবাঁক এ-সবই নতুন ও পুরনো মেশানো হস্তাভরণ। এ যুগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি অলঙ্কার হচ্ছে মানতাসা ও রতনচূড়। হিন্দুযুগের ভাস্কর্যে এ দুটির দেখা মেলে না। মানতাসায় রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের কবচের স্মৃতি, অনেক সোনা দিয়ে তৈরি করা এই অলঙ্কারে সূক্ষ্মতার অভাব আছে এবং সেজন্যই এটি হিন্দু নারীদের পছন্দসই অলঙ্কার হয়ে

ওঠেনি। প্রাচীনযুগের নারীরা নিচের হাতে কোন আঁটসাঁট অলঙ্কার পরতেন না, চুড়ি, বালা কঙ্কণই ছিল প্রধান আভরণ। মানতাসা, চূড়, ব্রেসলেট, রিস্টলেট, চেন, ব্যাঙ্গেল সবই এসেছে পরে, তবে চূড় বালা-কঙ্কণের মতোই অলঙ্কার, খিল দেওয়া চূড় বা চূড়ের মতো গয়নার চল্ কবে হল জানা নেই, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'কুলুপিয়া' শব্দের উল্লেখ আছে। রতনচূড় পরা হয় হাত ও হাতের পাঁচ আঙুল মিলিয়ে। খুব সুন্দর অলঙ্কার। বাঈজীদেব অলঙ্কার হিসেবে এটি সুপবিচিত, নিশ্চিত করে বলা না গেলেও মনে হয়, রাজপুত ঘরানার ছাপ এতে রয়েছে। মুঘলযুগের অলঙ্কারে রাজস্থান ও গুজরাটের মহিলাদের অলঙ্কারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আবার তাঁরাই মুঘল অলঙ্কারের অনুকরণ করেছেন অন্যদের চেয়ে বেশি, তাই এঁদের শিল্পরুচি অভিন্ন ছিল মনে হতে পারে। আসলে রাজ অন্তঃপুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এঁদের মধ্যে ছিল, কারণ রাজপুত-ললনাবা মুঘল হারেমে বেগম হয়ে প্রবেশ করতেন। অপরদিকে বেগম ও শাহজাদীদের সাজ ছিল সম্ভ্রান্তবংশীয়া বধূ-বিবিদের অনুকরণীয়। এখন যেমন, তখনও তেমনি এঁরা উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন হারেমের 'ফ্যাশান' বা নতুন সাজপোশাক কি আসছে তা জানবার জন্যে এবং সেটাই হয়ে যেত তাঁদের সমকালীন সাজ। দূরের দেশগুলিতে সবসময় তা সম্ভব হত না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় কল্পনার আশ্রয় নিতে হত। অর্থাৎ মূল গয়নাটি তৈরি হত ঠিকই কিন্তু তাতে যুক্ত হত সেই দেশের শিল্পীদের পরিচিত কোন নকশা। পোশাকের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটত। শালে ছিল না ধানের ছড়ার নকশা, বালুচরী শাড়ির লতাপাতায় কোনদিন ফোটেনি চিনার পাতার আদল। মুঘল হারেমে কি রাজপুত রাওলায় নেই মাছের

আদলে গড়া কানফুল কি শাড়ির পাড়ে শাঁখের নকশা। দক্ষিণ ভারতে রয়েছে গোপুরমের মতো মাথা উঁচু করা নকশা, শিকারের নকশা এসে ছায়া ফেলেনি সেখানে।

আংটি পরার অভ্যাস যে প্রাচীন ভারতে ছিল সে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' পড়েই বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, রাজার আংটি অনেক সময় অভিজ্ঞান হিসেবে ব্যবহৃত হত। মুঘলযুগে আরশি আর ছল্লা আঙুলের অলঙ্কার হিসেবে পরিচিত ছিল। এগুলো একটু বড় আকারের আংটি এবং পরা হত তর্জনীতে। সাধারণত মহিলারা কেউই গয়না হিসেবে তর্জনী বা অঙ্গুষ্ঠে আংটি পরেন না, পরেন বাকি তিন আঙুলে, বিশেষ করে অনামিকায়। বেলুরের মদনিকার অঙ্গুষ্ঠে কিংবা ভুবনেশ্বরের নায়িকার তর্জনীতে আংটি আছে, তবে এদের সংখ্যা বেশি নয়। আরশিতে মুখ দেখাও চলত ; অনেক সময় আংটির পাথরের নিচে লুকোনো থাকত উগ্র বিষ, পান করে মৃত্যুবরণ করবার জন্যে। বলা বাহুল্য এসব আয়োজন ছিল রাজা ও রাজপরিবারের জন্যে। সাধারণ মানুষের তো হঠাৎ আত্মহত্যা করবার দরকার হয় না, তাই তাদের নাগালের বাইরেই থাকত এসব আংটি।

কোমর থেকে পা পর্যন্ত খুব বেশি গয়না পরবার অবকাশ নেই। ভারতীয় নারীরা এ অংশ পোশাকে আবৃত করে রাখতে ভালবাসে, আর দেখা না গেলে গয়না পরে লাভ কি! মজার ব্যাপার এই যে নবাবী আমলে হারেমে আবার 'দেখা-গয়না' পরার ভারী নিন্দে ছিল। অর্থাৎ গয়না পরা হবে, অথচ দেখা যাবে না—তা কি করে হয়? সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা হাতে বাহুতে গয়না পরে তার ওপর মসলিনের পটি জড়িয়ে রাখতেন। স্বচ্ছ মসলিনের ভেতর থেকে দেখা যেত অলঙ্কারের দ্যুতি। সরাসরি গয়না পরত নর্তকী এবং

গায়িকা অর্থাৎ পেশাদার বাঈজীরা। যাঁরা পুরো হাত ঢাকা জামা পরতেন তাঁদের হাতের কিছুটা অংশ কেটে সেখানে মসলিনের টুকরো কিংবা পরবর্তীকালে নেট লাগানো হত।

কোমরে পরার জন্যে মধ্যযুগে এল পাহজেব, বঞ্জর, জিঞ্জির ও ঘুংরু। আগেকার মেখলা, চন্দ্রহার ও কিঙ্কিণীই নাম বদল করল বলা চলে। পায়ে মল, ছানলা, চুটকি এসব তো ছিলই। নিম্নমধ্যবিত্তরা ব্যবহার করতেন কোমরে গোটহার ও নিমফল—এটা কিছুদিন আগেও ছিল। মুঘল শাহজাদী অর্থাৎ রাজকুমারীরা এছাড়া ব্যবহার করতেন মুক্তোর জালের চাদর। ওড়নার মতো সেই মুক্তোর চাদর তাঁদের দুই কাঁধের দুপাশে ঝুলত। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যা, তা হল এই পর্বে গয়না ও সাজসজ্জায় অতিরিক্ত আড়ম্বর। সৌন্দর্য নয়, সংখ্যাধিক্যই যেন লক্ষ্য। এর রেশ ছিল আধুনিক যুগের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

নূরজাহান এই সংখ্যাধিক্যে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না। বার্ণিয়েরের বর্ণনা থেকে জানা যায় মুঘল হারেমের পোশাক এত সূক্ষ্ম হত যে, কোন কোন পোশাক একরাত্রির বেশি ব্যবহার করা যেত না। সেই পোশাকে থাকত সোনার ঝালর, সূক্ষ্ম নকশা, রেশমের ফুল, জরির কাজ—নূরজাহান নিজে আবিষ্কার করেছিলেন অনেক নকশা, কিনারি বা লেস। শোনা কথা, অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো বোতামের আবিষ্কর্ত্রীও তিনিই। গল্পটি হল, নূরজাহান একদিন রাজদরবারে যাবেন, মুঘল মহিষীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই রাজসভায় যেতেন বলে জানা যায়, দরবারে যাবার উপযুক্ত বেশবাস সম্পূর্ণ হবার পর দেখা গেল তাঁর পোশাকের এক জায়গায় ফিতে বসাতে ভুলে গেছে দরজি। কী হবে? কার বুঝি গর্দান যায়!

সম্রাজ্ঞীর এক প্রত্যুৎপন্নমতি পরিচারিকা নিজের কান থেকে সোনার ঝুমকো দেওয়া কুণ্ডলটি খুলে সেটি দিয়ে আটকে দিলেন জামার দুটি প্রান্তভাগ। মুগ্ধ হলেন নূরজাহান। বললেন, তাঁর সব পোশাকে ফিতে বা পটির বদলে এই নতুন জিনিসটি লাগানো হবে, আর যে পরিচারিকার কল্পনা থেকে এটি উদ্ভূত হয়েছিল তাকে শুধু পারিতোষিকই দিলেন না, তার নামেই এর নাম হল 'বাটটান'। এখন এটিকে নিছক গল্প বলে মনে হলেও মনে রাখতে হবে নূরজাহান এজাতীয় অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন। প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে তাঁর অসামান্য আবিষ্কার আতর।

প্রসাধনের ক্ষেত্রে মুঘল-রমণীরা হিন্দুদের প্রসাধন ব্যবহার করতেন না। কাজলের বদলে চোখে পরতেন সুরমা, আলতার বদলে পরতেন মেহেদি। তবে শুধু পায়ে নয়, হাত দুখানিতেও মেহেদির পাতা দিয়ে নানারকম নকশা আঁকতেন। দরিদ্র মেয়েরা রতনচূড় পরতে পারতেন না, তাঁরা হাতের ওপরদিকেও নানারকম নকশা এঁকে রতনচূড়ের অভাব দূর করতেন। আরো দরিদ্র গ্রামবাসীরা গয়নার বদলে হাতে-গলায় গয়না পরবার জায়গায় উলকি দিয়ে আঁকিয়ে নিতেন গয়নার নকশা। বিহারের গ্রামাঞ্চলে এখনও এ দৃশ্য দুর্লভ নয়। অপরদিকে সম্ভ্রান্ত পরিবারে, বিশেষত বঙ্গদেশে, নারীদের উলকি পরা নিষিদ্ধ ছিল বলা চলে।

মুঘল সাজপোশাকের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের মেয়েদের সাজপোশাকেরও মিল ছিল। তাঁরা পরতেন পিরান, দোপাট্টা ও পাজামা, তবে মুকুট পরতেন না। মুসলমান সমাজে খোঁপা বাঁধারও চল্ ছিল না, তাঁরা লম্বা বেণী বাঁধতেন মুক্তোর গুছি দিয়ে। টিপ পরতেন না, কপালে থাকত নানারকম অলঙ্কার। বুঁদির

রাজপরিবারের মেয়েরাও পরতেন পিরান, পাজামা, পটকা ও দোপাট্টা, মাথায় পরতেন লম্বা টুপি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেটি বেশি চলত তা হল—ঘাগরা, চোলি ও ওড়না। পাহাড়ী চিত্রে এর প্রাধান্য চোখে পড়বেই। এদের ঘাগরার ঘের বেশি, মাটি-ছোঁয়া। ওড়নাও বিশাল, মাথা ও বুক ছাড়িয়েও পেছনে থাকে পর্যাপ্ত অংশ। কাংড়া চিত্রেও এই পোশাকের প্রাধান্য। কোন কোন ছবিতে দেখা যায় ওড়নার একপ্রান্ত কোমরে গোঁজা। তার ফলে ঘাগরাও ঢেকে গেছে ওড়নায়। অনেকের মতে, আধুনিক যুগে ভারতীয় নারীর সবচেয়ে প্রিয় পরিচ্ছদ শাড়ি জন্ম নিয়েছে এই ওড়না থেকেই।

হিন্দুযুগে চাদর ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা ছিল না। বধূ ছাড়া কাউকে ঘোমটা টানতে হত বলেও মনে পড়ে না। তাই নানারকম খোঁপা বাঁধার চল্ ছিল পুরোমাত্রায়। মুঘল আমলে, যদিও পারস্যে ওড়নার প্রচলন হয়েছিল কিনা জানা নেই, অবগুণ্ঠন নারীর অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠল। এ ওড়না খুব ছোট, শুধু মাথা-মুখ ঢাকা দেবার জন্যে, বোরখার ঝরোকার মতো। ভারতে এই ছোট্ট ওড়নাটি রূপ বদল করতে শুরু করল এদেশের চাদরের অনুকরণে। রাজস্থানে ওড়নার কড়াকড়ি ছিল এবং এ সময় থেকেই মেয়েরা ধীরে ধীরে অন্তরালবর্তিনী হতে শুরু করেন। মুসলিম কন্যাদের বাইরে বেরোতে হলে বোরখা পরতে হত। হিন্দুরা টানতেন দীর্ঘ ঘোমটা, যদিও তাঁরা ক্রমেই লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতে লাগলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সম্ভ্রান্ত পরিবারে বালিকা বধূ একবার দীর্ঘ ঘোমটা টেনে পিত্রালয়ের গণ্ডি পার হয়ে সেই যে শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করতেন আর কখনও সে বাড়ির চৌকাটের ওপারে পা রাখতেন না। লক্ষ্মণের অদৃশ্য গণ্ডি টানা হয়ে যেত তাঁদের চারপাশে।

এর মূলে কী ছিল ? লজ্জা ? না, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ? আসামের শিবসাগর অঞ্চলে আহোম রাজাদের বাসস্থান হিসেবে যে গড়গাঁও কারেং তৈরি হয়েছিল, সেখানে আলো-হাওয়া-যুক্ত সুন্দর ঘরগুলিতে থাকত রাজবাড়ির পরিচারিকা লিগড়ি দাসীরা, আর রানী ও রাজপরিবারের কন্যা ও বধূরা থাকতেন মাটির নিচের অপেক্ষাকৃত আলো-বাতাসহীন ঘরগুলিতে। কারণ ? শত্রু আক্রমণ করলে এবং রাজবাড়িতে প্রবেশ করলে তারা সুসজ্জিতা দাসীদের সুসজ্জিত ঘর থেকে রানী ভেবে ধরে নিয়ে যাবে। নিচে, সাধারণ পোশাকে লুক্কায়িতা রানী রক্ষা পাবেন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে। কম-বেশি এ মনোভাব থেকেই সম্ভবত এদেশে পর্দার উৎপত্তি।

অনেকে মনে করেন, শাড়ির আবিষ্কর্ত্রী দরিদ্র নারীরা। ধনী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যখন তিনটি করে পোশাক পরছেন — ঘাগরা, কাঁচুলি ও ওড়না এবং পিরান, পাজামা ও দোপাট্টা, তখন গরীব মানুষেরা নিরুপায় হয়েই একখানি কাপড়ে নিজেদের সর্বাঙ্গ আবৃত করতে শুরু করে। এই কাপড়টি প্রথমে ছিল ওড়না, পরে রূপান্তরিত হয় শাড়িতে। ওড়না যখন বড় হতে শুরু করে তখন অন্য দুটি অর্থাৎ ঘাগরা, কাঁচুলি পর্যবসিত হয় সায়া ও ব্লাউজে। সে অবশ্য অনেক পরের কথা, অনেক জল ঘোলা হয়ে যাবার পর। দীর্ঘদিন ধরে এক বস্ত্রই ছিল সাধারণ ঘরের মেয়েদের একমাত্র পোশাক। এই বস্ত্রই হচ্ছে শাটি বা শাড়ি বা ধুতি। ধুতি শুধু পুরুষেরা পরতেন না — মেয়েরাও পরতেন অভাবের দিনে। শ্রীমতী লিওনাউন্‌স হিন্দু বধূর সাজও দেখেছিলেন এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন একখানি শাড়িকে অপূর্ব ভঙ্গিতে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আবার সেই শাড়ির আঁচল দিয়েই ঘোমটা টানা দেখে। তাঁর মনে হয়েছিল এই সাজটি নারীকে শুধু যে নতুন

ব্যক্তিত্ব দেয় তা নয়, এতেই ভারতীয় চারিত্র-বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়।

দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় নারীর সাজসজ্জার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে পরিবর্তন থাকলেও তার মধ্যে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য কখনও ছিল না। সেই সূক্ষ্ম বস্ত্র, সেই মনোরম নকশা ও রঙ, সেইসব নয়নমোহন অলঙ্কার এবং প্রসাধন প্রাচীনযুগেও যা ছিল, মুসলমান শাসকদের সময়েও তা একেবারে বর্জিত হয়নি। বরং বদলেছিল বিদেশিনীদের পরিচ্ছদ—তাঁরা যা এনেছিলেন পারস্য থেকে। পারসীক পোশাক আবার প্রভাবিত হয়েছিল চীন থেকে আসা বস্ত্রের প্রভাবে। চীনা সিল্কের বয়নরীতিতে মিশেছিল পারসীক নকশা—ভারতে সবই এল। আগেও আসত, তবে এত ব্যাপকভাবে নয়। নবাগত শাসকরা তাঁদের নিজস্ব পোশাক বলে এগুলিকে কিছুদিন সযত্নে ব্যবহার করলেন, আমীর-ওমরাহ, রাজা-উজিররা অনুকরণ করবার জন্যে তা নিয়ে গেলেন নিজেদের অন্তঃপুরে এবং ভারতীয় পোশাকের সঙ্গে এরা কিভাবে মিলেমিশে গেল বুঝতেও পারলেন না। ভারতীয় পোশাকের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল লক্ষ্য করবার মতো। সব সময়ই যে কোন পোশাকের সৌন্দর্য এবং সৌকর্য-গুণটি সে নিজের পোশাকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারত। যা অন্য কোন দেশের পোশাকের মধ্যে নেই। যা ছিল শুধু আচ্ছাদন, ভারতে এসে তা হয়ে উঠেছে রমণীয়, সুন্দর ও আরামপ্রদ। এই তিনটি গুণ যে ভারতীয় পোশাকে নেই, সে পোশাক এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পায়নি, ফ্যাশানের মতো এসেছে, আবার চলেও গেছে।

শ্রীমতী লিওনাউন্‌স আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন,

সেটি হল ভারতীয় নারীদের রঙ নির্বাচনের আশ্চর্য ক্ষমতা এবং এ ক্ষমতা বিশেষভাবে দেখা যেত হিন্দু নারীদের নিজস্ব নির্বাচনে। তাঁর মতে, নিতান্ত সাদাসিধে মেয়েরাও বর্ণ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং তার ফলে তারা নিজেদের সাজপোশাকের মধ্যে একটি Perfect harmony সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

ভারতে বহিরাগত কম আসেনি। শাসক হিসেবে এসেছে প্রবল পরাক্রমী দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ— মুসলমান ও খ্রীস্টান। আমাদের কাছে পাঠান-মুঘল-নবাব-বাদশাহ সকলেই মুসলমান আর পোর্তুগীজ ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি এখানে এসে যতই কলোনী তৈরি করুন ইংরেজরা ছিলেন প্রধান এবং এঁরা সকলেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন সাহেব হিসেবে। পোশাকের ক্ষেত্রেও প্রধান প্রভাব পড়েছে এঁদেরই। বিশেষ করে পুরুষেরা রাজার পোশাককে নিজেদের পোশাকরূপে গ্রহণ করেছেন প্রাণের তাগিদে, রাজদরবারে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র তাঁদের রাজপোশাক পরতে হত। তাই হিন্দুদের সাবেকী সাজ ছেড়ে চোগা-চাপকান-পাগড়ি পরতেও যেমন তাঁদের দেরি হয়নি, আবার কোট-প্যান্ট-শার্ট-টাই-টুপি পরে সাহেব সাজতেও তাঁরাই অগ্রণী। নারীদের, বিশেষ করে ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। চীন-জাপান-মিশর-তুরস্ক প্রভৃতি দেশের মেয়েরা যখন ক্রমশই নিজেদের সাবেকী সাজ ত্যাগ করে পশ্চিমী সাজপোশাককে একান্ত আপন করে নিয়েছে, ভারতীয় নারীরা তখনও নিজেদের বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে থেকেছেন। পরিবর্তন আসেনি কি? তা নয়, এসেছে। প্রবলভাবেই এসেছে, কিন্তু তার রূপ আলাদা। ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ ও পোর্তুগীজ মেয়েরা সংখ্যায় কম হলেও এদেশে এসেছিলেন, সঙ্গে এনেছিলেন তাঁদের দেশের সাজসজ্জা,

তাঁদের নিজস্ব রুচি। তারপর ভারতীয় মেয়েদের দেখে কেউ মুগ্ধ হয়েছেন, কেউ নাক সিঁটকেছেন ঘৃণায়। কিন্তু হারেমের নারীদের মতো ভারতীয় রুচিকে আত্মসাৎ করতে পারেননি। কারণ ভারতীয় নারীদের সংস্পর্শে আসাও সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। রাজপরিবার থেকে অনেক মেয়ে আসতেন হারেমে। হারেম থেকে কখনও হয়ত বেগমরা বেড়াতে যেতেন অন্তঃপুরের অঙ্গনাদের কাছে। ইউরোপীয় নারীদের সঙ্গে ভারতীয়দের এভাবে মেলামেশা কখনও সম্ভব হয়নি, এমনকি দেশীয় মহারাজারা যখন ইউরোপে গিয়েই যে কোন দেশের এক মেমসাহেবকে রানী করে ফিরে আসতেন তাঁরাও ভারতের অন্তঃপুরে ভারতীয় রানীদের মতো জীবনযাপন করতেন না। স্বদেশের মতো করেই সাজাতেন শ্বশুরবাড়িটিকে না হোক নিজের মহল বা ঘরটিকে। মেলামেশা করতেন স্বজাতীয় পুরুষ ও নারীদের সঙ্গে। ভারতীয় নারীরাও এ সময়ে পুরোপুরি পর্দানশিন, বিদেশিনীদের ভাষাও তাঁদের অপরিচিত, পুরুষদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেন বলেও বিদেশিনীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই সঙ্গত মনে করতেন। সেইজন্যে সাধারণত সাহেব-মেমরা ভারতে এসে যাঁদের দেখতেন তাঁরা সবাই হয় বাঈজী বা নর্তকী, গায়িকা ও গণিকা, নয় পরিচারিকা বা শ্রমিক শ্রেণীর নারী।

এলিজা ফে ভারতে এসেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে। কিন্তু ভারতীয় সম্ভ্রান্ত নারীদের সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাকুক চোখের দেখা দেখতেও পাননি। একদিন তাঁর সে সৌভাগ্য ঘটল। ১৭৮১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে তিনি লিখেছেন, 'একবার আমি দৈবাৎ দুটি অতীব সুন্দরী মহিলাকে দেখে ফেলেছিলাম। কিন্তু নানারকমের বেশভূষায় ও গহনাগাটিতে তাঁরা এমন সুসজ্জিত

যে সত্যিই আসলে তাঁরা কতখানি সুন্দর তা বলা মুশকিল। যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাজগোজ করতে তাঁদের সমস্ত সময়টুকু কেটে যায়। মাথার চুল বাঁধতে, চোখের ভ্রূ-জোড়া ও পাতা কাজল-কালো করতে, দাঁত-হাত-নখ সুদৃশ্য করতে প্রচুর সময় ও অবকাশের দরকার হয়। হিন্দু রমণীদের প্রসাধন-নৈপুণ্য দেখলে অবাক হতে হয়। সাজগোজের কলাকৌশল চর্চা করতে এত বেশি সময় তাঁরা অতিবাহিত করেন যে মনে হয় যেন এছাড়া আর কোন কাজ নেই তাঁদের। কিন্তু তার জন্য তাঁদের বোধহয় দোষ দেওয়া যায় না, যেহেতু রূপচর্চা তাঁদের করতেই হয়, প্রথমত, স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য, দ্বিতীয়ত, সপত্নীদের চিত্তাকর্ষণের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করার জন্য।'

এর পঁয়তাল্লিশ বছর পরের কথা। ফ্যানি পার্কস এসেছেন ভারতে। চার বছর ধরে তিনি এদেশে রয়েছেন কিন্তু পরিচারিকা আর বাঈজী ছাড়া কোন ভারতীয় নারীর মুখ দেখেননি। সুযোগ পেলেন এতদিনে। ১৮২৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি লিখছেন একটি ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, তারপর গৃহস্বামীর নির্দেশে তিনি অন্দরমহলে গেলেন। 'গৃহস্বামীর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলা আত্মীয়েরা এসে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। দুজন মহিলা রীতিমতো সুন্দরী দেখতে। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝলাম কেন অন্দরমহলে এই মহিলাদের স্বামীরা ছাড়া অন্য সকলের প্রবেশ নিষেধ। তাঁদের পরনে অতি সূক্ষ্ম বেনারসী শাড়ি, সোনার জরির পাড় বসানো, দুই পেঁচ দিয়ে গায়ে জড়ানো, প্রান্তটি বা আঁচল পিঠে ফেলা। এই বস্ত্রের তলায় অন্য কোন অন্তর্বাস নেই। কাজেই গায়ে

দুই পেঁচ জড়ানো থাকলেও তা এত সূক্ষ্ম যে অঙ্গের শোভা পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয় তার ভেতর দিয়ে। মনে হয় যেন একটা রেশমী ওড়না গায়ের ওপর ফেলা রয়েছে। গলায় ও হাতে সোনা-হীরের অলঙ্কার।'

অপরদিকে, পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে পারসী সমাজে নারীরা অবরোধের মধ্যে ছিলেন না বলে তাঁরা বিদেশীদের সঙ্গে কিছুটা সহজভাবে মিশতে পেরেছিলেন, তাদের পোশাকও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। জ্যাকেট, ব্লাউজ, পেটিকোট, ফ্রক, গাউন, শেমিজ—সব কিছুকেই তাঁরা স্বাগত জানালেও শাড়িকে বর্জন করেননি। আবার ভারত-প্রবাসী পোর্তুগীজ কন্যাদের ওপরেও যে ভারতীয় পোশাকের প্রভাব পড়েনি তা নয়, দমনের এক বিবাহ-আসরে শ্রীমতী লিওনাউন্‌স দেখেছিলেন গাঢ় রঙের পোর্তুগীজ মেয়েরা লম্বা সাদা প্যান্ট আর পুরনো আমলের গোলাপী ফ্রক পরে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। কনের পোশাকের মধ্যে সাদা মলমলের দীর্ঘ ভেল পরা হয়েছে মুসলমানী কায়দায়, তাতে তার সবটাই ঢাকা পড়ে গেছে। এর সঙ্গে সে পরেছে সোনা ও চুমকির অলঙ্কার। যা পোর্তুগীজ কনের অঙ্গে থাকার কথা নয়। ক্রমে ভারতেও ইউরোপীয় প্রভাবের প্রসার হয়। এ প্রসঙ্গে ইউরোপের সাজ ও ফ্যাশান সম্বন্ধে দুটো একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

তার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক, এই সময়ে আমাদের বাঙালী মেয়েদের সাজ কেমন ছিল। কেমন করে তাঁরা সাজতেন, চুল বাঁধতেন, কিরকম শাড়ি পরতেন ? নতুন যুগের পোশাক এসে পড়ার আগে কেমন করে নিজেকে নব-নব রূপে সাজিয়ে তুলতেন বঙ্গললনারা, সেকথা কিছুটা জানা গেছে এলিজা ফে ও ফ্যানি পার্কসের বর্ণনা থেকে। আমরা শুনেছি, সপ্তদশ কি অষ্টাদশ শতকে

উত্তর ভারতের সর্বত্রই ছিল ঘাগরা, কাঁচুলি, ওড়না। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন ছবিতে কাছা-দেওয়া শাড়িপরা মহিলা দেখা দিতে শুরু করলেও, তাঁরা শাড়িকে বুকের আঁচলের মতো ব্যবহার করতেন না, শাড়ি পরতেন পুরুষদের ধুতি পরার মতো শুধু নিচের অঙ্গে, এছাড়া বুকে থাকত কাঁচুলি ও পরে স্বতন্ত্র ওড়না। তবে উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতে অবগুণ্ঠনের প্রাবল্য ছিল না। বধূর পক্ষেও ঘোমটা টানা ছিল নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার, মাথা ঢাকা থাকত না বলেই কেশসজ্জা দক্ষিণ ভারতে আবশ্যিক। মাথার চুলে ফুল দিতেই হবে। অলকে কুসুম না দিলে দক্ষিণী নারীর সাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

অন্যান্য অঞ্চলে অধিকাংশ নারীর পোশাক ছিল কাংড়া চিত্রের নায়িকাদের মতো। এমনকি বঙ্গদেশে, গ্রামাঞ্চলে পাওয়া পুঁথি-পত্রের মলাট বা কাঠের পাটাতে অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণলীলার রাধা ও তাঁর সখীদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব তাঁদের পোশাকেও কাংড়া চিত্রের প্রভাব রয়েছে। সর্বত্র রঙের আশ্চর্য সুষমা, বৈচিত্র্য ও সুদৃশ্য নকশার প্রাবল্য। মধ্যযুগের মেয়েরা রঙ নির্বাচনে আধুনিক ম্যাচিং-এর ধার ধারতেন না। একই রঙের ঘাগরা, চোলি ও ওড়নার ম্যাচিং কোথাও চোখে পড়ে না। তাঁরা লাল রঙের ঘাগরা, সবুজ কাঁচুলি ও হলুদ রঙের ওড়না একই সঙ্গে পরতেন। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, মেরুন, বেগুনি, কমলা প্রভৃতি গাঢ় রঙের সংমিশ্রণে তাঁদের বেশবাস উজ্জ্বল হয়ে উঠত। চীনা-বস্ত্রে ছিল লম্বা ডোরা, ভারতের কলমকারি প্রিণ্ট ছিল নানারকমের, ছিল ভেজিটেবল কালার বা প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি করা রঙ—সব কিছু প্রভাব ফেলেছিল ভারতীয় পোশাকে। হারেমের মেয়েরা লম্বা ডোরা

দেওয়া পাজামার ওপরে পরতেন হালকা মসলিনের ওপর হাতে ছাপা কাপড়ের পেশওয়াজ।

বাঙালী মেয়েদের সাজসজ্জার বহু খবর পাওয়া যায় মধ্যযুগের কাব্য-কবিতায়। খণ্ড খণ্ড সাজগোজের বিবরণ ছাড়াও কয়েকটি সুসজ্জিতা নারীচিত্র চোখে পড়বার মতো। কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব উপমার ওপরে নির্ভর না করে সংস্কৃত কাব্যের নায়িকাদের চিরাচরিত রূপবর্ণনার ওপর নির্ভর করতেন। সেগুলি বাদ দিলে বারবার যা চোখে পড়ে তা হল রাধার নীল শাড়ি। ‘চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিতে মোর’ চিরকালের প্রেমিকের উক্তিতে পরিণত হয়েছে। সেইসঙ্গে বঙ্গনারীর নীলাম্বরী-প্রীতির কথাও গাঁথা হয়ে গেছে। একসময় শান্তিপুরের সূক্ষ্ম নীলাম্বরী নারীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে নারীদের সাজসজ্জার তৎকালীন বাস্তবচিত্র চোখে পড়ে। যেমন লহনার রূপচর্চা—

‘লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মানিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ী॥
অবধানে আলুয়ায় বন্ধনের দড়ি।
দোছুটী করিয়া পরে বারো হাত শাড়ি॥
দুর্বলা মার্জয়ে কেশ লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম কনক দর্পণী॥
আঁচড়িল কেশপাশ নানা পরবন্ধে।
তৈলযুত হয়ে পড়ে লহনার স্কন্ধে॥
কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি।
দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটি॥

মাছেতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।
বাছিয়া পরয়ে মেঘডম্বরু কাপড়॥
দোহারা কাকালি বান্ধি হইল ঋজুকায়।
মণিময় হার কুচ যুগলে লোটায়॥
বসনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর।
বিনোদ কাঁচলি পরে তাহার উপর॥
যতনে পরয়ে রামা কজ্জ্বল সিন্দুর।
মার্জন করিয়া পরে মণি কর্ণপুর॥'

(কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)

বঙ্গদেশে বস্ত্রালঙ্কারের অভাব ছিল না, বরং বস্ত্রশিল্প চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল ১৭শ-১৮শ শতকে। একটি বর্ণনায় 'পদ্মাবতী'র নানা-রকম পোশাকের নাম পাওয়া যায়—

'বসন ভূষণ সব বর্ণিতে না পারি।
ক্ষেণে পাট নেত শাড়ি, ক্ষেণে জরতারি॥
ক্ষেণে শাখা রম্ভাপতি ক্ষেণে গঙ্গাজল।
ক্ষেণে কিরিমিজি পৈরে ক্ষেণে মলমল॥
ক্ষেণে কৃষ্ণ ক্ষেণে রক্ত শ্বেত পীত বাস।
ক্ষেণে মুজাম্বর ক্ষেণে নেলদম তাস॥
নানা দেশী নানা বাস নানা রঙ্গে পৈরে।
তিলে তিলে নানা ভাতি নানা বর্ণ ধরে॥'

এ সময়কার লোকগীতিকায় আরো বহু শাড়ির নাম পাওয়া যায়। যেমন, অগ্নিফুলি, আসমানতারা, উদয়তারা, ময়ূরপাঙ্খা, মেঘডম্বুর, যাত্রাসিদ্ধি, শ্রীরামখানি, লক্ষ্মীবিলাস, মুক্তামণি, গঙ্গাজলি, বসন্তবাহার, পবনবাহার, আগাডুরি, কনকলতা এবং বিশেষ করে নীলাম্বরী—

'শান্তিপুরের ডুরে শাড়ি সরমের অরি।
নীলাম্বরী উলঙ্গিনী সর্বাঙ্গ সুন্দরী॥'

পূর্ববঙ্গে অগ্নিপাটের শাড়িও খুব জনপ্রিয় ছিল, নাম শুনে মনে হয় লাল সিল্কের শাড়িকে বলা হত অগ্নিপাটের শাড়ি—

'বাপে ত কিনিয়া দিত অগ্নিপাটের শাড়ি।
সেই অঙ্গে পরিয়া থাকি জোলার পাছাড়ি॥'

সব শাড়িই ছিল অবিশ্বাস্য রকমের স্বচ্ছ ও হালকা।

কালাপেড়ে শান্তিপুরীর স্বচ্ছতা ধরা পড়েছে শিল্পীর চোখে, কালীঘাটের পটের ধরনে আঁকা ছবিতে সেই স্বচ্ছতা চোখে পড়ার মতো।

লোকসঙ্গীতেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায় সাজসজ্জার মনোরম বিবরণ। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বিবরণ নাগরিকাদের সাজ-সজ্জার তুলনায় খুব সামান্য, তবু নারীমনের আকাঙ্ক্ষার রূপটি সেখানে স্পষ্ট। একটু হলুদ মাখা, একটু তেল মেখে চুল বেঁধে তাতে ফুল গোঁজা আদিবাসী সমাজের পক্ষে যথেষ্ট। কোথাও আছে ফুলতোলা পাড়ের কাপড়, কানফুল, কিংবা ছোটখাট জিনিসের কথা। সাধারণত দেখা গেছে শ্রমিক-নারীসমাজের অধিকাংশই পছন্দ করেন মোটা শাড়ি, যে শাড়ি পরলে 'গা দেখা যায় না' সেই শাড়ি, হয়ত তাঁদের সবসময় ঘরের বাইরে বেরোতে হয় বলেই তাঁরা পাতলা শাড়ি পরিহার করে চলেন। বাঁশপাহাড়ীর লোকসঙ্গীতে পাই—

'ও তুই পরবি রে কেমন করে
ঝরনা শাড়ি সামিজ না হলে···।'

কিংবা—

‘ফর্দি শাড়ি   সামিজ না হলে
তোরা চলবি গো কেমন করে।’

অবশ্য বিলাসিতার জন্যে ছিল ফর্দি শাড়ি। তাই মানিনী বধূর মান ভাঙাবার সময় বলতেই হয়—

‘ও বড় বউ রাগ কেনে, দাদা দিবে আজ শাড়ি কিনে,
টাওনায় আছে ফর্দি শাড়ি, তোমায় দিবে আজ কিনে।’

নারীর সজ্জাপ্রিয়তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এমন বহু গানে, কবিতায়। যেমন, ‘মাগো আমি কাপড় নিব ধারে ধারে ধাকৃচি ফুল।’ কিংবা—

‘চিক পেড়ে বোম্বাই শাড়ি লো এঁটে পর লো কোমরে
পথে যেতে রোদের আভায় যেন লো ঝলমল করে।’

লোকসমাজে বিয়ে উপলক্ষে কনে সাজানোর গানে পাওয়া যায় অনেকরকম শাড়ির নাম—

‘পরথমে পৈরাইল শাড়ি নাম গঙ্গাজল।
নউখের উপরে তুলিলে শাড়ি করে টলমল॥
সেই শাড়ি পইর‍্যা কন্যা শাড়ির পানে চায়।
অইল না তার মনের মত দাসীরে পৈরায়॥
তারপর পৈরাইল শাড়ি নাম মুক্তামণি।
সাত রাজার ধন লাগগ্যাছে শাড়ির গাঁথুনি॥
সেই শাড়ি পৈরাইয়া কন্যা শাড়ির পানে চায়।
দিল মন না খুশি হইল খুলাইয়া ফালায়॥
তারপর পৈরাইল শাড়ি তার নাম কেঁও।
শাড়ির মধ্যে আকৃকিয়া থুইছে বিয়াল্লিশ গাঁও॥

আর এক শাড়ি তুল্‌লা রাখছে 'আছমানতারা' নাম।
লতাপাতা আঁকছে কত নসিবিন্দা কাম॥
সাজিয়া পরিয়া কন্যা রূপের পানে চায়।
চান সুরুজ লজ্জা পাইয়া আবের নিচে যায়॥
এর পরে আইন্যা বাটা কন্যা মুখে দিল পান;
ঘর তনে বাইর অইল পুণ্যিমায়ের চান॥'

এই বর্ণনায় একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নিম্নবিত্ত সমাজে নারীর সাজে ছিল একটাই পোশাক—শাড়ি। প্রসাধন বলতে পানের রসে রাঙানো ঠোঁট। প্রতিটি অঞ্চলেই দেখা যাবে দরিদ্র নারীর এই স্বল্প সাজ—প্রসাধন, অঙ্গরাগ এঁদেরও প্রিয়, কিন্তু অর্থাভাবে তা নিয়ে বিলাসিতা করার স্বপ্নও তাঁরা দেখতে ভুলে গিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক উপাদানেই নিজেকে সাজাতে চেয়েছেন। চর্যাপদের শবরী ময়ূরপাখা আর কুঁচফল দিয়ে যেমন নিজেকে সাজায়, সাঁওতাল মেয়েদের সাজেও রয়েছে সেই অনাড়ম্বর সারল্য।

বঙ্গদেশে হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করতেন মুসলমানেরা। ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের যোগ থাকলেও তাঁরা হিন্দু প্রভাব এড়াতে পারেননি। সাধারণত তাঁদের মেয়েরা মুঘল রীতির সাজসজ্জাই অনুসরণ করতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে নওয়াজিস খান যে কনে সাজানোর বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে শ্রীমতী লিওনাউন্‌সের বর্ণনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই আছে। বাঙালী কবি জোর দিয়েছেন অলঙ্কারের ওপর—

'প্রথমে কোড়াই কেশ দিয়া চতুর্সম।
বান্ধিল পাটের জাদে খোপা মনোরম॥
তাহাতে মুকুতা ছড়া করিল শোভন।
চন্দ্রিমা উদিত যেন বিদরিয়া ঘন॥

সিঁথিপাতি মধ্যেত সিন্দুর বিরাজিত।
যেন প্রকাশিত হইল প্রভাত আদিত্য ॥
রত্নের টিকলি বিন্দু ললাটেত শোভা।
বালাচন্দ্রে পাইল কিবা পূর্ণচন্দ্র প্রভা ॥
রতনে মুকুতা জাল উপরে ঢাকিল।
সেহেন নক্ষত্র বৃষ্টি মেঘেত প্রকাশিল ॥
কপালে তিলক দিল সনেত্র বরণ।
হরেত সুধঙ্গে গ্রহি যেন ত্রিলোচন ॥’

নানা কারণে এই চিত্রটি মূল্যবান। মুসলমান সমাজে টিপ পরার চল্ ছিল না, সিঁদুরও না। কিন্তু এখানে ‘গুল-এ-বকাউলি’তে সিঁদুর ও তিলকের কথা আছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে কাছাকাছি থাকার জন্যে উভয় সমাজের নারীরা একে অপরের পোশাক ও প্রসাধনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন, ঠিক যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন পশ্চিমাঞ্চলের অর্থাৎ রাজস্থান ও গুজরাটের মেয়েরা। নওয়াজিস খানের বর্ণনা অবশ্য এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। তিনি এ-বিষয়ে আরো যা বলেছেন তা হল এই—

‘নাসিকায় বেশর দিল রত্ন শোভাকর।
হরি শিরচক্র যেন অরুণ প্রচার ॥
যুগল শ্রবণে দিল রত্নের কুণ্ডল।
অলকা ফণীর মুখে মাণিক্য উজ্জ্বল ॥
বাহুমধ্যে চড়াইল রত্ন বাজুবন্ধ।
সুবর্ণের তাড় যুগ শোভিত সুছন্দ ॥
করেত কঙ্কণ নবরত্ন শোভা করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুলিরত্ন অতি জ্যোতি ধরে ॥

গলে শোভা করিল সুবর্ণ তে-লহরে।
কণ্ঠমালা গজমোতি মণি বহুতর ॥
কোমরে কিঙ্কিণী নবরত্নে সপ্তলহরী।
বাজরি শোভিত কটি চতুর দিগ ভরি ॥
পায়েত ঘঙ্গুর দিল চলিতে বাজন।
সুবর্ণ মোকব দিল জড়িত রতন ॥
আঙ্গুলে নালিকা সাজে সুবর্ণ গঠিত।
সর্ব অঙ্গ অলঙ্কার অধিক শোভিত ॥
তাতে বহু মূল্য পাটাম্বর পরাইল।
কটি অলঙ্কার তুলি তার পরে দিল ॥
গলেত কঞ্চুলি দিল সুবর্ণ জড়িত।
আকল ঘোঁঘট দিল শিরেত শোভিত ॥
তাহাতে তোরণ শোভে অমূল্য বসন।
হরিতাদি মসবস্ত্র কিংবা কিংকন ॥
কিরমিজ বস্ত্র অতি মূল্য ধরে।
হরিসে কন্যারে পরাইল সআদরে ॥'

দীর্ঘ বর্ণনা। উদ্ধৃতি বড় হয়ে গেল, কিন্তু প্রয়োজন আছে। নারী-সজ্জার দীর্ঘ বিবরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা হল পৌনঃপুনিকতা এবং কাল্পনিক বর্ণনা। কিন্তু এ বর্ণনাটিতে পাচ্ছি বিস্তৃত বিবরণ, প্রথমে চুল আঁচড়ে পাটের জাল দিয়ে খোঁপা বাঁধা হল, তাতে পরানো হল মুক্তোর মালা। সিঁথিতে সিঁদুর নয়, সিঁথি এবং টিকলির সঙ্গে কপালে তিলক ও সিঁদুর টিপ, সারা মাথায় মুকুট এবং জাল। এছাড়া নাকে বেশর, কানে কুণ্ডল, ওপর হাতে বাজুবন্ধ ও সোনার তাড়, হাতে কঙ্কণ এবং আঙুলে আংটি। বাকি কি রইল?

গলায় তে-লহর কণ্ঠমালা, কোমরে সাতনরীর কিঙ্কিণী, পায়ে ঘুঙুর, মোকব (?) ও চুটকি। দামী পাটের শাড়িটি পরিয়ে সযত্নে কোমরের কিঙ্কিণীটি তার ওপর তুলে দেওয়া হল। জরির কাজ করা কাঁচলি ও স্বচ্ছ ওড়নায় ঘোমটা! একেবারে নিখুঁত সাজ।

এর পাশেই আর একটি বর্ণনা দেওয়া যাক। এটি কিন্তু একটি বারবনিতার অঙ্গসজ্জা। শুকুর মামুদের দেওয়া—

'হস্তে করি নিল বেশ্যা সুবর্ণের চিরুণি।
মস্তকের কেশ চিরি গাঁথিল বিয়ানি॥
গন্ধ পুষ্প তৈল বেশ্যা পরিল মাথাতে।
সুবর্ণের জাদ বেশ্যা পরিল খোপাতে॥
কাম সিন্দূরের ফোঁটা পরিল কপালে।
দীননাথ উদিত যেন প্রভাতের কালে॥···
জোড় ডোঙের মধ্যে পরে তিলকের ফোঁটা।
সিন্দুরিয়া মেঘে যেন বিজলির ছটা॥
নঞানে কাজল পরে মেঘের সনে বাদ।
লক্ষের বেশর বেশ্যা পরিল নাসিকাত॥
মন্ত্র পড়িয়া তৈল মাখিল বদনে।
আঁখির ঠমকে জ্ঞান হরে যুবকজনে॥
অধর শোভিত কর্ম কর্পূর তাম্বুলে।
দশন ভ্রমর যেন বসিল কমলে॥···
কপালের সেঁতি পাটি হীরায় জড়িত।
কিঞ্চিত হাসিতে যেন তারা বিকশিত॥
গলেতে পরিল বেশ্যা শতেশ্বরী হার।
সুবর্ণের প্রদীপ যেন জ্বলে অন্ধকার॥

বাহু মৃণাল যেন লক্ষ চাম্পার কলি।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে বাহে পরে কলি ॥
করেত কঙ্কণ যেন নিশানাথের শোভা।
হৃদয়ে কনক স্তন অতি মনোলোভা ॥
অপূর্ব কাঁচলি পরে বুকের উপরে।
দেখি দুই স্তন যুবকের মন হরে ॥
কমরে পরিল বেশ্যা লক্ষ মূল্যের শাড়ি।
রসিক জনের মন বেশ্যা নেএ হরি ॥
কর্ণেতে পরিল বেশ্যা হীরাধর কড়ি।
আঁখি ঠারে মুচকি মারি মন্মথএ কাড়ি ॥
বাঁকপাতা মল পায়ে সুবর্ণের পাসলি।
যুবক পাইলে বেশ্যা মন করে চুরি ॥
গন্ধর্ব চন্দনে অঙ্গ করিল ভূষিত।
মধু লোভে অলি ধাএ দেখিলে কিঞ্চিত ॥’

এখানে রয়েছে একটি মনোহারিণী গণিকার সাজ। বধূসজ্জার সঙ্গে তার পার্থক্যটি চোখে পড়ার মতো এবং পড়ার কথাই। সাধারণত মধ্যযুগের বর্ণনাতে আমরা এই বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই না। তাঁরা অনেক সময় রূপ এবং সাজসজ্জার বর্ণনা করেন প্রথানুগ ভাবে। মুকুন্দরাম যেমন সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন উত্তর-যৌবন লহনার সাজসজ্জায়, তেমনি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে নওয়াজিস খান ও শুকুর মামুদের রচনায়। সেজন্যই এই দুটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি। বারবধূর রূপসজ্জায় কবি প্রাধান্য দিয়েছেন তার প্রসাধনের ওপর, অলঙ্কার নির্বাচনের ওপরও। কিভাবে তনুশ্রীকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায় রূপোপজীবিনীর সাধনা সেটাই।

এখানে তার সাজসজ্জাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না, মনে রাখতে হবে এও একটি শিল্প এবং দীর্ঘ প্রস্তুতি ও চিন্তা না থাকলে সর্বাঙ্গসুন্দর সাজ সম্ভব নয় কখনই। এবং এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাবু-সংস্কৃতির অন্তরালে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের অতৃপ্তি ও ভাঙনের পদধ্বনি।

বারবনিতার সাজসজ্জায় প্রাধান্য পেয়েছে অঙ্গ প্রসাধন। সুগন্ধি তেল মেখে চুল আঁচড়ে বিনুনি বাঁধার পর সে পরেছে সিঁদুর টিপ, ভ্রূ যুগলের মাঝখানে ছোট্ট একটি তিলক। নাকে বহুমূল্য বেশর, চোখে কাজল পরে সে মুখে মাখলে মন্ত্রপড়া তেল (সম্ভবত ক্রীমের বিকল্প কোন কিছু) যাতে তার মুখটি চকচকে হয়। ঠোঁট রাঙালে কর্পূর ও পান খেয়ে (সুগন্ধের জন্য কর্পূর)। কপালে হীরের সিঁথি, গলায় শতনরী হার, আঙুলে আংটি, বাহুতে ফুলের কলি (বা কুঁড়ির মালা, কুঁড়ি-সদৃশ সোনার চুড়িও হতে পারে)-গাঁথা মালা, হাতে কঙ্কণ। সুন্দর কাজ করা কাঁচুলি ও মূল্যবান স্বচ্ছ ধরনের শাড়ি (তখন মসলিন শাড়ির খুব দাম ও চাহিদা ছিল)। কানে ঝোলানো দুল বা হীরাধর কড়ি, পায়ে বাঁকপাতা মল ও পাসলি। এছাড়া, সর্বাঙ্গে গন্ধর্ব চন্দন মাখা ছাড়াও তার নয়নে রইল অনবদ্য ভঙ্গি ও ঠোঁটে মুচকি হাসি। এবং এখানেই তার সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হয়েছে। লক্ষণীয়, বধূসজ্জায় ছিল প্রাচুর্য, একটি নারীকে সর্বাঙ্গীণভাবে সালঙ্কারা ও সৌন্দর্যে পূর্ণ করার চেষ্টা, দ্বিতীয় নারীর সাজে প্রাচুর্য নেই, ছিল রুচিবোধ এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দানের চেষ্টা। রূপচর্চা দুটোই, কিন্তু দুটির রূপ আলাদা। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দুটির মধ্যে যথার্থ সম্মিলন না ঘটলে সার্থক অঙ্গসজ্জা বলা চলে না। বিশেষ করে নারী সাজসজ্জায় প্রাচুর্যকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গেলেই বোধহয়

তার সৌন্দর্য চোখে পড়ে বেশি। আধুনিক যুগ আসার অব্যবহিত পূর্বেকার রূপসজ্জায় যা অতিমাত্রায় প্রকট। প্রসঙ্গত বলে রাখি ভিন্ন রাজ্যের লোকসাহিত্যে, রাজগাথায় এমন বহু বর্ণনা পাওয়া যায় যার মধ্যে সেই অঞ্চলের নারী এবং পুরুষের সাজপোশাকের কথা আছে। স্থাপত্য এবং চিত্রকলার মতো এই বাণীচিত্রগুলিও আমাদের সামনে বহু তথ্য তুলে ধরে।

আধুনিক যুগে আসার অব্যবহিত পূর্বের সময়টির কথা একটু বলে নেওয়া যেতে পারে। এই সময়টাকে বাবু সংস্কৃতির সময় বলে ধরে নিতে পারি, এঁদের ঘরের বধূদের কথা আগেই বলেছেন এলিজা ফে ও ফ্যানি পার্কস। যদিও পর্দানশিন, তবু তাঁদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গয়না ও দামী শাড়িতে মোড়া থাকত। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন বিহার অঞ্চলের ধনী মুসলমান ঘরের বধূদের দেখেছিলেন গয়নার ভারে ক্লান্ত জড়পদার্থরূপে। একটি গৃহে গিয়ে তিনি দেখেন এক দুলহিন বেগমকে, এ শব্দের অর্থ বধূবেগম, বা বেগমের পুত্রবধূ। এরপর রোকেয়ার ভাষায়, 'শরীরের কোন্ অংশে কয় ভরি সোনা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। ১) মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্ধ সের (৪০ ভরি)। ২) কর্ণে কিঞ্চিৎ অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)। ৩) কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)। ৪) সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)। ৫) কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)। ৬) চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা! বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে উহার ব্যাস সার্ধ চারি ইঞ্চি (কোন কোন নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চি হয়। ওজন এক ছটাক)। পরিহিত পাজামা বেচারা সলমা চুমকির কারুকার্য ও

বিবিধ প্রকারের জবির (গোটা পাট্টার) ভারে অবনত। আর পাজামা ও দোপাট্টার ভারে বেচারি বধূ ক্লান্ত। ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়-পদার্থ না হইয়া কী করিবেন ?' এই শেষ নয়, আরো আছে। বধূর কেশসজ্জা—'সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া কেশবিন্যাস, বেণী ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা', শুধু তাই নয়, 'অর্ধেক মাথায় আটা সংযোগে আফ্‌শাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুমকি বসানো হইয়াছে।' উপবস্তু 'ভ্রূ-যুগ চুমকি দ্বারা আচ্ছাদিত, কপালে রাঙের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা সংযোগে বসানো হইয়াছে।' এই সাজসজ্জা কি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম ?

সুফিয়া কামাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের কথা। সেখানে অলঙ্কারের প্রাচুর্য এত বীভৎস হয়ে ওঠেনি। তবে সেখানে সোনা পরার চল্ ছিল না। মুসলমান সমাজে, প্রচুর সোনার গয়না পরতেন তাঁদের আমলা-কর্মচারী-ডাক্তার-কবিরাজদের স্ত্রীরা। এঁরা সবাই হিন্দু। সুফিয়া লিখেছেন, 'আমাদের খানদানে সোনা কেউ বড় একটা পরতেন না। সাচ্চা পাথরের জড়াও (এখন একে বলা হয় জড়োয়া) গয়না এবং সাধারণত মোতির ব্যবহার বেশি ছিল। মুরুব্বীরা বলতেন সোনা যদি আমরা পরব তবে বাঁদী-চাকরানী-দাই-খেলাইরা কি পরবে ?' এভাবে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির ছবি পাওয়া যায়, অবশ্য রোকেয়া বহু পূর্ববর্তিনী, তাঁর রচনাটি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৩১১) তখন সুফিয়া জন্মগ্রহণ (১৩১৭) করেননি। তাহলেও সব মিলিয়ে সময়টি বহু দূরের নয়, এই শতকেরই গোড়ার কথা।

অষ্টাদশ শতকের কাগজপত্রে গয়নাপত্রের কথা খুব বেশি পাওয়া

যায়। অনুমান করা যেতে পারে একদিকে স্ত্রীধন হিসেবে গয়নার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও অপরদিকে সম্পদ হিসেবে গয়নার মূল্য-বৃদ্ধি—এ সময় থেকে ভারতীয় অর্থনীতিতে ছাপ ফেলতে থাকে। যা ছিল শুধুই দেহসজ্জার উপকরণ, নারীর রূপরচনার প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য যার ব্যবহার হত, এখন সেই অলঙ্কার হয়ে উঠল সম্পদ এবং সৌন্দর্যবৃদ্ধি নয়, সম্পদ দেখানোর আগ্রহই এ সময়কার সাজ-সজ্জায় প্রাধান্য লাভ করেছিল।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীর একটি হিসেবের খাতা পাওয়া গিয়েছিল। এতে তাঁর দিনপঞ্জী ও খরচের হিসেব ছাড়াও যা ছিল, তা হল 'গহনার ফর্দ'। পড়লে বিস্মিত হতে হয়, একজন নারীর এত গয়না! অথচ এরকম নাকি সেকালে অনেকের ঘরেই ছিল। বিয়ের সময় মেয়েকে দিতেন পিতা, শ্বশুরবাড়ি থেকেও সে গয়না পেত কিছু। বিশেষ করে সাধের সময় বা অন্য উপলক্ষেও গয়না দেবার চল্ ছিল। সেকালের বাবুরা পুজোর সময় গিন্নিদের জন্যে গড়াতেন ভারী ভারী গয়না। ফকির গরীবুল্লাহের 'সোনাভান' বলেছিল—

'সেই মর্দ দিবে মোরে অষ্ট অলঙ্কার ॥
তারবালা বাজুবন্ধ গলায় হাসুলি।
সিঁতেপাটি চন্দ্রহার পায়েত পাসুলি ॥
কানে কানবালা দিবে গলায় দিবে হার।
হাতে চুড়ি পৌঁছি আর সাজের সোনার ॥'

এটাই বোধহয় সালঙ্কারা বধূর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সাজের অর্থাৎ অলঙ্কারের ফর্দ। কৈলাসবাসিনীর ফর্দে দেখা যায় তিনি হিসেব করছেন তাঁর কি কি গয়না আছে, কত গয়না তিনি তাঁর মেয়েকে

দিয়েছেন এবং নিজে কত গয়না পেয়েছিলেন। এই ফর্দটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এতে বঙ্গনারীদের সম্পদ, বাসনার চিত্র, অলঙ্কারের নকশা বা ডিজাইন এবং তৎকালীন রুচি ও প্রবণতার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জানা যাচ্ছে, এ সময় অন্তঃপুরিকারা পরস্পরকে সোনার গয়না পরতে দিতেন, ধার দিতেন, উপহার দিতেন, আবার বন্ধকও দিতেন। বলা বাহুল্য এসব খবর বাবু মহলে পৌঁছত না। কৈলাসবাসিনী লিখছেন—

'সব সমেত আমার এই গহনা। পায়ে ঘুমুর দেয়া ছগাছা মল। কোমরে ছুই ছড়া চন্দ্রহার আর গোট চাবি শিকলি। হাতে বালা দমদম মিচরি তিন জোড়া, পিনখাড়ু তিন জোড়া। যোড়য়া (জড়োয়া) পঁইচা, হাতা হার, জাল ও হাতের মুকুতা। হাতে চালদানা, মরদানা, নঙ্গ কলি (লবঙ্গ), নঙ্গ ফুল, নারিকেল ফুল, মাছুলি, সোনালি, সোনার পঁইচা, বাউটি ও হাত মাছুলি। উপর হাতে তাবিজ, বাজু, তাগা, জসন ঝাঁপা ও নবোরত্ন। গলায় ডামন (ডায়মণ্ড)কাটা চিক, জড়োয়া চিক, গোপ হার, দড়ি হার, হেসো হার। ন-নর গোলমালা সাত-ন নর দানা, পাঁচ নর পান হার, ন-নর মুকুতা, দো-নর মুকুতা, মুকুতার কণ্ঠি, আরেক ছড়া কণ্ঠি। কানে তিন জোড়া চৌদানি, ছু' জোড়া কানবালা, মুকুতার গোছা, কান, কর্ণফুল, ঝোমকা। মাথার সিঁতিও ফুলকাটা গোট, গলার চাপকলি ও ধুকধুক।'

পড়তে পড়তে মনে হয় যেন বৌবাজারের কোন সম্পন্ন গয়নার দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কত ডিজাইন, কত নকশা, এবং কতরকম নাম। আমাদের সৌভাগ্য কৈলাসবাসিনী এরপর জানিয়েছেন তাঁকে অলঙ্কারগুলি কে কে দিয়েছেন। এতে তৎকালীন কতকগুলি চিত্র বেশ স্পষ্ট হয়। যদিও তা রূপরচনার

কাজে লাগে না কিন্তু নেপথ্য চিত্রটি অস্পষ্ট থাকে না। যেমন, কৈলাসবাসিনী লিখছেন—

'আমার গহনা পিতাঠাকুর দেন—হাতে চালদানা, পলাকাটি, মাদুলি, পঁইচা, বাউটি, তাবিজ ও বাজুদানা, কণ্ঠমালা। পায়ে ছগাছা মল ও পাঁইজোর, গোকরি, পথম ও চুটকি। কানে বোঁদা ও মাছ। কোমরে রূপার চন্দ্রহার, গোট ও চাবি শিকলি।' এগুলো সবই কৈলাসবাসিনী পেয়েছিলেন বিয়ের সময়। কারণ তারপরই তিনি লিখেছেন, 'এই সকল আমার শাশুড়ী ঠাকুরানী নেন, তাঁর ভিক্ষাপুত্রের বৌকে দেন।' বালিকা বধূ মুখ ফুটে আপত্তি জানাতে পারেননি, তবে তাঁকেও বঞ্চিত হতে হয়নি। শাশুড়ি তাঁকে গড়িয়ে দেন নতুন গয়না এবং সবই খুব ভারী।

'আমাকে আশী ভরির ঝুমুর দেয়া ছগাছা মল দেন। আশী ভরির খোটায়ে পাজর (পাঁয়জোর?) দেন। বালা, ডামনকাটা পাড়িখাড়ু, হাতহার, চালদানা, নবঙ্গকলি, বাউটি ৪০ ভরির, গোলমালা ১৪ ভরির, ১২ ভরির তাবিজ, ৫ ভরির দুইখান বিল্বপত্রে বাজু, গোপহার, মুকুতার কণ্ঠি, পানহার, সিঁতি, দো-নর মুকুতা। ২৮ ভরির সোনার চন্দ্রহার, কানবালা, কর্ণফুল, ঝুমকা, চৌদানি, মুকুতার গোছা, দুইটি ছোট ছোট ঝুমকা, দুইটি ছোট ফুল, দুইখানি পিপুলপাত।'

এই চিত্র থেকে মনে হয়, বধূকে উভয় পক্ষই প্রচুর গয়না দিতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ম ছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে অলঙ্কার পাঠানো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও এ নিয়ম ছিল। প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন তাঁর বিয়ের পরদিন দেবর বাড়ির সরকারকে সঙ্গে নিয়ে গহনার বাক্স দিয়ে যান। উৎসবের সময় তাঁদের নানারকম অলঙ্কার পরতে হত। প্রফুল্লময়ী লিখেছেন, 'বাড়ির যে

নতুন বৌ আসিত তাহাকে আরো বেশি রকম গহনার উৎপাত সহ্য করিতে হইত। আমি তখন নতুন বৌ, কাজেই আমারও অবস্থা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গলায়—চিক, ঝিলদানা ; হাতে—চুড়ি, বালা, বাজু-বন্ধ ; কানে—মুক্তার গোচ্ছা, বিরবৌলি, কানবালা ; মাথায়—জড়োয়া সিঁথি ; পায়ে—গোড়ে, পায়জোড়, মল, ছানলা, চুটকী। এই ছয়-সাত সের ওজনের গহনা পরিয়া চলাফেরা করিতে হইত।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটা সময়ে ভারতের সব অঞ্চলেই, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, মেয়েদের প্রচুর পরিমাণে গয়না পরার চল্ দেখা গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতেও যে হয়নি তা নয়, সে দেশে এখনও প্রচুর গয়না পরা হয়। নাকে হীরের গয়না, হাতে-কানে-গলায় সোনার গয়না পরা দক্ষিণী কন্যার সংখ্যা আজও কম নয়, এর সঙ্গে তাঁরা মাথায় পরেন ফুল। উত্তর ভারতে এর প্রচলন কম। কৈলাসবাসিনীর গয়নার ফর্দ অবশ্য এখনও শেষ হয়নি। তিনি লিখছেন—

'তারপরে স্বামী দেন তাবিজের ঝাঁপা, তাগা, দুইখান ডামনকাটা বাজু, একছড়া চন্দ্রহার, একছড়া গোট, একছড়া চাবি শিকলি, একটা নথ, ৩০০ টাকার মুকুতা, ন-নর মুকুতা। হাতের মুকুতা, হাতের জাল, দুই জোড়া পিন খাড়ু, বড় মুকুতার কণ্ঠি, জড়োয়া চিক, ডামনকাটা চিক, সাত নর দানা, এক জোড়া ভাল চৌদানি, দুইছড়া জড়োয়া পঁইচা, দুইখান ছোট ডামনকাটা বাজু, নবরত্ন, চাঁপ কলি, ভাল চাউদানি এয়ারিন, দড়ি হার, ১০ ভরির গোপ হার, দমদম গোখরি ডামনকাটা চুড়ি। আর আর বাকি যত গহনা সকল স্বামী দেন।'

আগেই বলেছি, নারীরা তাঁদের অলঙ্কারকে মনে করতেন স্ত্রীধন এবং বাড়ির পুরুষদের অজ্ঞাতেই তাঁরা এসব গয়না বদল করা কিংবা

নতুন করে গড়াতে দ্বিধা করতেন না। মেয়ে বাপের বাড়ি এলেই গয়না ভেঙে নতুন গড়ানোর চল্ ছিল। 'শিবায়ন'-এ উমা অভিমান করে পিতৃগৃহে ফিরে এলে জননী প্রবোধ দিতেন 'নথ ভেঙে ভবানী গড়াঅ নাকচনা' বলে। কৈলাসবাসিনী কাকে কী কী গয়না দিয়েছিলেন তাও লিখে রেখেছিলেন। নিজের মেয়েকে তিনি দিয়েছিলেন পান হার, কানবালা, মল, পাঁয়জোর ও একটা নথ। এগুলো কুমুদিনী পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে বিয়ের সময়, পিতৃপ্রদত্ত গয়না এ নয়। মেয়ের সাধের সময় কৈলাসবাসিনী দিয়েছিলেন জাল ও তাগা। হাতের মুক্তোর সেটটি মেয়ে দাম দিয়ে কেনে আর ১৮ ভরির গোখরি (হার ?) এমনি নেয়, অর্থাৎ বিনিময় হয়নি।

এছাড়াও অনেককে অনেক দিয়েছিলেন কৈলাসবাসিনী ; কাউকে পুরনো গয়নাটি, আবার কাউকে নতুন করে গড়ানো গয়না। ক্ষোভ ছিল দুটি-একটি, 'প্রিয়নাথের স্ত্রী বালা ও তাবিজ বাঁধা দে নেয় একশত টাকা। সে একদিন বাপের বাড়ি যায়, তার বালা ও তাবিজ, আমার ডামনকাটা চিক পরে, তাহা যদু রায় ফাঁকি দে দেয়।...বাজু আমার মামাতো ভাজ পরতে নেন, তাহা আমাকে দিলেন না, ৫০ টাকা দে পাঠায়ে ছিলেন, তাহা আমি রাগ করে নিলেম না, তাহা আর পাইলাম না।' এইসব ছোটখাট ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি অলঙ্কার নারীজীবনে শুধুমাত্র দেহসজ্জার বস্তু হয়ে না থেকে স্ত্রীধনে পরিণত হচ্ছিল এবং তার ফলে, যা মূল প্রয়োজন অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, তার প্রতি ক্রমেই আগ্রহ কমে যাচ্ছিল। পুষ্প অলঙ্কারে নারীর অঙ্গে যে লাবণ্যসঞ্চার হত, পরিমিত ও নির্বাচিত অলঙ্কার দেবদাসীর অঙ্গে সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করত, গত শতকের অলঙ্কার সে প্রয়োজন সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল।

পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে বিয়ের সময় মেয়েকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অলঙ্কার দিতে হত মেয়ের অভিভাবকদের এবং এটি শেষে অত্যাচারের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাব। জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন তাঁর দিদির বিয়ের কথা। পাত্রপক্ষ চেয়েছিলেন—

'মুকুট নয় ভরি, কান ছয় ভরি, সাত নরী চোদ্দ ভরি, চূড় চোদ্দ ভরি, বালা পাঁচ ভরি, জড়োয়া মুক্তার মীনার সরস্বতী হার একটি, জড়োয়া নেকলেস একটি, খোঁপার ফুল চিরুণি চার ভরি, তাবিজ সাত ভরি, বাঁক পাঁচ ভরি, গোঠ দশ ভরি, রুপোর মল তিরিশ ভরি, পাঁয়জোর কুড়ি-পঁচিশ ভরি।'

পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় বেগম রোকেয়ার দেখা মুসলমান বধূটিকে। অবশ্য দ্বিতীয় দফায় পাত্রপক্ষ আরো একটি ফর্দ পাঠালেন, কারণ মেয়ের গাত্রবর্ণ ঈষৎ চাপা, মাঝারি ধরনের ফর্সা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের গায়ের রঙের ওপর তার সৌন্দর্যবিচার করা হত। ভারতে ফর্সা রঙের বড় বেশি আদর, 'সর্বদোষ হরে গোরা'—বাস্তবে কিন্তু সৌন্দর্য নির্ভর করে সব কিছু মিলিয়ে দেখার ওপর। গৌরী কন্যা নিশ্চয় সুন্দরী কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গীও কিছু কম নয়। প্রাচীন সাহিত্যে দুইয়েরই সমাদর লক্ষ্য করা যায়। পার্বতীর গায়ের রঙ সোনার মতো উজ্জ্বল, দ্রৌপদীর গায়ের রঙ নীল পদ্মের মতো। যাইহোক, রঙ নিয়ে সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করতেন মেয়েরাই, বিয়ের আগে মেয়ে নির্বাচন করা হত বর্ণবিচার করে। জ্যোতির্ময়ীর দিদির রঙ চাপা বলে এবার ফর্দ এল, 'মুকুট, ঝাপটা, ফুল, চিরুণি, কাঁটা, রতনচূড়, নেকলেস, চুড়ি, বালা, জশম, তাবিজ, বাজু, অনন্ত, কান, ইয়ারিং, চিকহার, বিছা বা সূর্যহার, চরণপদ্ম, মল, পাঁয়জোর

এবং গহনাগুলি যেন ভাল হয়।' নতুন ফর্দে সুকৌশলে অনেকগুলো নাম যোগ করে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় ফর্দ অনুযায়ী গয়না দেওয়া হয়নি। যাক, আমরা আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নতুন যুগের সাজসজ্জার কথা জানতে হলে গত শতকের এই প্রেক্ষাপটটিকে মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুত, এ সময়েই সৌন্দর্যচর্চায় সবচেয়ে বেশি অধঃপতন হয়েছিল বললে খুব ভুল বলা হয় না। কারণ ভাল শাড়ি-গয়নাকে বিচার করা হত সৌন্দর্য দিয়ে নয়, মূল্য দিয়ে। সাজসজ্জায় সুরুচির বালাই ছিল না, ছিল অর্থের দম্ভ। মুঘলযুগে যা শুরু হয়েছিল, এখানেই তার চূড়ান্ত রূপ চোখে পড়ে।

সোনা-রুপোর জরির পাড় বসানো বেনারসী, পঞ্চম পেড়ে, গুলবাহার প্রভৃতি শাড়ি, কলসীর কানার মতো চওড়া বাউটি, গলায় একগাদা ঝুড়ি, ঢ্যালা প্রভৃতি নানা আকারের সোনার গয়না এই দাঁড়িয়েছিল সংস্কৃতি বা পরম্পরা, প্রতিটি গয়নাই হত ভারী, কাজেই সূক্ষ্মতার অবকাশ ছিল না। শাড়ির পাড়েও কত ভরি রুপো আছে তার হিসেব করা হত। এক-একটি শাড়িতে কুড়ি-পঁচিশ তোলা খাঁটি রুপোর জরির কাজ থাকত। কিন্তু কোন কিছুই যেমন চিরস্থায়ী নয় তেমনি ভারতীয় নারী তাঁর রূপরচনায় এই ধারাও দ্রুত বদলে ফেললেন। এর সুখস্মৃতি রয়ে গেল প্রাচীনাদের স্মৃতিতে। কিন্তু নবীনারা পরিবর্তনপ্রিয়, তাই পালাবদল শুরু হল এবং সেও এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে।

আধুনিক যুগ আসার অব্যবহিত আগে এদেশে এক বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্রেক হয়েছিল। অভিজাত মহিলারা অনুকরণ করতে শুরু করলেন ইউরোপীয় সাজপোশাকের, না করে উপায়ও ছিল না।

শিক্ষিত মেয়েরা ঘরের বাইরে পা রাখবার সময় অনুভব করলেন, তাঁদের সাবেকী সাজে পরিবর্তন না আনলে বাইরে বেরোনো সম্ভব নয়। সূক্ষ্ম একবস্ত্রা বঙ্গনারীরা দ্বিধার মধ্যে পড়লেন। এই সমস্যা অল্পবিস্তর অন্যত্রও ছিল, তবে যাঁরা মুসলমানী পোশাক বা সালোয়ার কামিজ-ওড়না-পেশওয়াজ-বোরখা ব্যবহার করতেন তাঁদের এ সমস্যা ছিল না। হিন্দু, বিশেষ করে বাঙালী বা পূর্বাঞ্চলে এ সমস্যা বেশি ছিল। কারণ তাঁরা পুরোপুরি একবস্ত্রা ও পর্দানশিন ছিলেন। তাই যাঁরা বাড়ি থেকে বাইরে বেরোবার কথা ভাবতে শুরু করলেন; তাঁদের প্রথমেই ভাবতে হল পোশাকের কথা। ঠাকুরবাড়ির মধ্যমা বধূ অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি স্বামীর কর্মস্থলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিপদে পড়েছিলেন পোশাক নিয়ে। তাঁর জন্যে ফরাসী দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল 'ওরিয়েণ্টাল ড্রেস'। বলা বাহুল্য সে পোশাক ভারতীয় নয়, জ্ঞানদানন্দিনী তাকে বলেছেন কিম্ভূত-কিমাকার পোশাক এবং পোশাকটি পরাও কঠিন, একলা পরা যেত না। যাইহোক সেই পোশাক পরেই বাড়ির চৌকাট পার হয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। পোশাকের এই অসুবিধার জন্যে অনেকেই পুরোপুরি পশ্চিমী পোশাক পরতেন। ভিক্টোরিয়ান যুগের সাজসজ্জায় অতিরিক্ত শালীনতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিজাত এবং উচ্চপদস্থ বাঙালী কর্মচারীদের পরিবারের মহিলারা অনুকরণ শুরু করেছিলেন এঁদের। ঠাকুরবাড়ির কন্যা সৌদামিনী দেবীর কন্যা ইন্দুমতী এই পোশাকই পরতেন। মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের স্ত্রীরা গাউন পরতেন। ভারতে যে ইউরোপীয়ান মহিলারা আসতেন, তাঁদের পোশাক ছিল পা পর্যন্ত লম্বা এবং ফ্রিল ও ঝালর দেওয়া গাউন,

গলাবন্ধ, পুরো হাতা এবং লেস বসানো, পায়ে থাকত জুতো, মোজা, অনেকসময় হাতে দস্তানা, মাথায় পরতেন টুপি কিংবা জড়াতেন রুমাল।

আধুনিকতার সূচনায় প্রকাশ্যে বেরোবার জন্যে বঙ্গনারীরা এ পোশাক সাদরে গ্রহণ করলেন। শুধু বঙ্গদেশে নয়, মাদ্রাজ এবং অন্যত্রও এ রীতি অনুসৃত হল। এ পোশাকের সঙ্গে আমাদের দেশীয় ঘাগরার বেশ মিলও ছিল। এরপর মেয়েরা চেষ্টা করতেন গাউনে ভারতীয় ধারা যোগ করে দিতে। তাঁরা গাউনের ওপরদিকে একটা আঁচল জুড়ে দিলেন। দুর্গামোহন দাশের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী এই পোশাক পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের পারসী মেয়েরা পর্দানশিন ছিলেন না এবং পোর্তুগীজ পোশাকের সঙ্গে একটু বেশি পরিচিত হওয়ায় বিদেশীদের অনুকরণে জ্যাকেট, সায়া, পেটিকোট ও শেমিজের ব্যবহার শিখে ফেলেছিলেন। এবং এগুলো তাঁরা ব্যবহার করতেন শাড়ির সঙ্গেই। তাই বঙ্গবধূ জ্ঞানদানন্দিনী বোম্বাইয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন সেখানকার মেয়েদের সাজবার ধরন-ধারণ। এতে বোঝা যায় জগাখিচুড়ি-মার্কা বিদেশী পোশাক ভারতে বেশিদিন চলেনি। তার অর্থ এই নয় যে ভারতীয় নারীরা ইউরোপীয় পোশাককে গ্রহণ করেননি। ভারতীয় নারীরা চিরদিনই সবরকমের পোশাককে সমাদর করেছেন, কিন্তু আত্মস্থ করে নিয়ে। কখনও বা একটু পরিবর্তন করে নিয়ে। একেবারে আধুনিক যুগে আসার আগে ভারতীয় মেয়েরা কয়েকবার সাজবদল করেছেন। এখনকার মতো সে যুগে তাঁরা বিদেশী পোশাককে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। জ্ঞানদানন্দিনী পারসী মহিলাদের সাজটি নিয়ে এলেন বাঙালীর অন্দরমহলে। তাঁর শাড়ি পরার ধরনটির নাম হল

‘বোম্বাইদস্তুর’। এতে শাড়ির অনেকটা অংশ থাকত হাতের ওপর, সেই হাতে কোন কাজ করা যেত না, শাড়ি ধরেই থাকতে হত। তাছাড়া বোম্বাইদস্তুরের কুঁচি দেওয়া অংশটি থাকত পেছন দিকে। আঁচলও থাকত ডান কাঁধে। জ্ঞানদানন্দিনী সে আঁচলটি আনলেন বাঁ দিকে। কলকাতায় এসে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন নতুন ধরনের শাড়ি পরা শেখাবেন বলে। আগ্রহ নিয়ে অনেকে এলেন এবং বোম্বাইদস্তুর নাম বদলে হল ‘ঠাকুরবাড়ির শাড়ি’। বলা বাহুল্য শিক্ষিত সমাজে এই রীতির আদর হওয়ায় এই ধরনটির আবার নতুন নাম হল ব্রাহ্মিকা শাড়ি।

এ সময়কার পালাবদলের দু-একটি অনবদ্য ছবি ধরে রেখেছেন শরৎকুমারী চৌধুবানী। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন লাহোর থেকে বধূ হয়ে। তার ফলে পার্থক্যটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি লিখেছেন, ‘আজকাল মেয়েদের মধ্যে এমন একটা খিচুড়ি পাকিয়েছে যে, একরকম পোশাকের কি একরকম কথাবার্তার মেয়ে তিন-চারিটি এক মজলিসে দেখতে পাওয়া ভার। যুবতীদের মধ্যে যে কত রকম-বিরকমের পোশাক উঠেছে, সে আর লিখে ওঠা যায় না—প্রায়ই কারও সঙ্গে কারও মেলে না—না সাজগোজেই মেলে, না পোশাকেই মেলে। মধ্যবয়স্কাদের মধ্যে বরং তার চেয়ে একটু মিল পাওয়া যায়। যুবতীদের দেখলে বোধহয় চেনা যায় না যে, তারা একজাতীয় স্ত্রীলোক।’ শরৎকুমারী একথা লিখেছেন ১৮৮১ সালে। দেখা যাচ্ছে, যুগ পরিবর্তনের হাওয়া সবসময়ই অল্পবিস্তর একরকম। একথা বোধহয় এখনকার মেয়ে মজলিস সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়। দুঃখের বিষয় গত শতকের সাজপোশাকের মূর্তি বা ছবি কোনটাই সুলভ নয়। কিছু ফটো পাওয়া যায় কিন্তু একত্রে সংগৃহীত হয়নি, সেসব রয়েছে

পারিবারিক অ্যালবামে। শরৎকুমারী এই সময়কার খিচুড়ি পোশাকের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন, ‘তারা সব এক-একটা বিশ্রী ধরনের পাতলা ওড়না মাথায় দিয়েছে···তার ভিতরে একজন একজন কোমর থেকে বোধহয়, এক হাত ওসারের একটা মোটা কাপড় পরেছে—একজন হাঁটু পর্যন্ত—আর একজন বেশ পা পর্যন্ত পরেছে। যেমন বাঙালীর মেয়েরা শাড়ি পরে, তেমনি করে পরে আঁচলটা কাঁধে ফেলে একটা করে কোমরবন্ধ পরেছে।···ওড়নাগুলো খুব পাতলা ও তাই দিয়ে মুখে ঘোমটা দিয়েছে—ওড়নার ওসার এক হাত হবে, এতে যদি দাড়ি পর্যন্ত ঘোমটা দেয়, তা হলেই কাজেই সমস্ত পিঠটা বেরিয়ে থাকে —তাদেরও তাই হয়েছিল।’ বেশ বোঝা যায় এই মহিলারা ছিলেন প্রাচীনপন্থী পরিবারগুলির প্রতিনিধি। এই বিবাহসভায় শরৎকুমারী দেবী আরো দেখেছিলেন, ‘কারও গায়ে জামা আছে—কারও গায়ে নেই। —কেহ বা পুরুষদের মত চায়না কোট পরেছে, কেহ বা ছেলেদের মত ঢলঢলে জামা পরেছে। কারও বা বেশ ভাল মেয়েলি জামা।’ এদেরই মধ্যে শরৎকুমারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটি মেয়ে, ‘একখানি বেশ ঢাকাই শাড়ি পরেছে, আর তার উপর একটা সাটিনের গাউন পরেছে—তাও আবার উল্টো—অর্থাৎ সুমুখ দিকটা পিছন দিকে রয়েছে—পিছনটা সুমুখ দিকে দিয়েছে। এ কোন্ দেশী পোশাক বল দেখি? পায়ে জুতো মোজা তো নেই-ই। রাজ্যের গয়না পরানো—মাথায় খোঁপা বাঁধা, শাড়ি পরা সবই আছে।’

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরে যাঁরা শাড়ি পরার নতুন ধরন নিয়ে এলেন তাঁরা হলেন কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবী ও তাঁর ছোট বোন ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবী। তাঁরা হিন্দুস্থানী ধরনে শাড়ি পরার ধরনটি ফিরিয়ে আনলেন তাঁদের শ্বশুরবাড়ির পারিবারিক

ঐতিহ্যবলে। উত্তর ভারতে অবাঙালী মহিলারা এখনও এভাবে শাড়ি পরেন। বস্তুত এই ধরনটি এসেছিল মুঘলযুগের শেষে কাংড়া চিত্র অনুযায়ী ওড়নাব আকাব বৃদ্ধি পাওয়ায়। এই ঢঙটি সত্যিই খুব সুন্দর এবং দামী শাড়ি, বিশেষ করে বেনারসী-বালুচরী জাতীয় শাড়ি পরার পক্ষে উপযোগী, কারণ এতে আঁচলটি ছড়িয়ে থাকে বুকের ওপর, কারুকাজটি সম্পূর্ণ চোখে পড়ে। এমনও হতে পারে, ভারতীয় শাড়িতে আঁচল যোগ করা হয়েছিল এই শাড়ি পরার ধরনটিকে মনে রেখেই। বস্ত্রশিল্প তথা শিল্পরুচির এই বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল ভারতীয় নারীর দেহসজ্জার জন্যে। আগেই বলেছি, শাড়ি বা ওড়নায় পাড় ও আঁচল যোগ করেই ভারতীয় পোশাক অনন্যতা লাভ করেছে। পৃথিবীব আর কোন দেশের নারীর পোশাকে এই বৈশিষ্ট্য নেই। বাঙালী মেয়েরা সুনীতি দেবী ও সুরুচি দেবীর শাড়ির ধরনও পুরোপুরি গ্রহণ করলেন না, তাঁরা আঁচলটিকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো বাঁ দিকে রাখাই সাব্যস্ত করলেন। এই ধরনটির চল্ ছিল দক্ষিণ ভারতে ও উড়িষ্যায়। বাঙালীবা এটিকেই গ্রহণ করলেন এবং নাম দিলেন মাদ্রাজী ধরন। যদিও এই আধুনিক ধরনটির জন্যে সব অঞ্চলের নারীরই কিছু না কিছু দান আছে এবং সেজন্যেই সকলে গ্রহণ করেছে। এখন এই ধরনে শাড়ি পরে সকলেই। সর্বভারতীয় স্তরে এর জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ বোধহয় এই ধরনটি সবার পক্ষে সহজ ও কাজকর্ম করার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। অবশ্য সারা ভারতে আরো অনেকরকম শাড়ি এবং শাড়ি পরার ঢঙ প্রচলিত আছে, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলে নিই, ভিক্টোরিয়ান প্রভাবে এবং ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় এদেশের সাজপোশাকে বা বলা চলে রুচিবোধের কিভাবে পরিবর্তন এল।

আমরা একে ভিক্টোরিয়ান প্রভাব বলেই উল্লেখ করব, কারণ ইউরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে এই সময়টি অত্যন্ত শালীনতাবোধের জন্য প্রসিদ্ধ। শিক্ষিত ভারতীয়রা এঁদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন এবং এদেশীয়দের, বিশেষ করে বাঙালীদের সাজপোশাকে দেখা যায় শুভ্র এবং নিরাভরণ সজ্জার প্রতি আগ্রহ। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী ছিলেন। তাঁদের পরিবারের নারীরাই লেখাপড়া জানতেন, প্রকাশ্যে বেরোতেন। বিকেলবেলা সপরিবারে বেড়াতে যাওয়া এবং চায়ের আসরে যোগ দেওয়ার মতো দুটি প্রধান ঘটনাও এল আমাদের জীবনে, ইংরেজের অনুকরণে। আজকের নগর-জীবনে বিশেষত কলকাতায় এ রীতি আর নেই, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে ধনী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এ প্রথা আরো অব্যাহত আছে। যাইহোক এসব আসরে প্রথমদিকে যোগ দিতেন ব্রাহ্মিকারাই। তাঁরা শিক্ষিতা এবং অতিমাত্রায় সচেতন হওয়ার জন্য পোশাকে-পরিচ্ছদে যথাসম্ভব শুচিস্মিত এবং সহজ ভাব আনতে চেষ্টা করেন। এঁদের পোশাকে শুভ্রতা বেশি। কালো পাড়, সাদা খোলের শাড়ি, সঙ্গে মানানসই জ্যাকেট ও ব্লাউজ এবং প্রয়োজনে একখানি চাদর—এই ছিল তাঁদের পোশাক। কোনরকম প্রসাধন তাঁরা ব্যবহার করতেন না, চুল বাঁধতেন এলো খোঁপার মতো জড়িয়ে কিংবা লম্বা একহারা বিনুনি দুলিয়ে। গয়নাও পরতেন না, পরলে বড়জোর দু-গাছি বালা, কানে টপ এবং গলায় পেন্ডেন্ট। জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর মেয়ে ইন্দিরাকে কান বেঁধাতেই দেননি। বলা চলে এই বিনা সাজে নিজেকে সাজিয়ে নেবার প্রচলন শুরু হল এ সময় থেকেই। এবং এরপর থেকে আমরা ভারতীয়দের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে দুটি রীতিরই কম-বেশি প্রাধান্য দেখতে পাব।

অপরদিকে দেখা গেল, উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘরে আর একটি পালার মহড়া চলছে। এখানেও ভিক্টোরিয়ান প্রভাব যে নেই তা নয়, তবে সাজে এসেছে পশ্চিমী প্রভাব। এঁরাই যথার্থ আধুনিকা এবং আজও আধুনিকাদের প্রতিনিধি। এঁরা পরতেন রঙিন সিল্কের পাড় বসানো দামী শাড়ি, লেস এবং ফার বসানো ব্লাউজ, জ্যাকেট, ফ্রিল দেওয়া ফ্রক, হাই-হিল জুতো, সঙ্গে পরিমিত অলঙ্কার—হার, বালা, দুল, আংটি এবং ব্রোচ। সর্বত্রই সাজপোশাক দিয়ে রূপ-রচনায় একটি ব্যক্তিত্ব আরোপের প্রয়াস দেখা গেল এই পর্বে। যা ইতিপূর্বের সাজসজ্জায় অজ্ঞাত ছিল। সাজের সঙ্গে ব্যবহার, হাসি, চোখের ভাষা, ভঙ্গি, কথা বলার ধরন, দাঁড়াবার কৌশল, বসবার স্টাইল সবই রূপচর্চার অন্তর্ভুক্ত হল। সেই সঙ্গে এঁরা বর্জন করলেন যা কিছু পুরনো রীতি, আলতা পরা, টিপ পরা ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় বস্তু। এগুলিকে ধরে নেওয়া হল, নিজেকে অপরের চোখের সামনে তুলে ধরার উপাদান হিসেবে। বহু অলঙ্কার পরিত্যক্ত হল, পেশাদার নর্তকী এবং গায়িকারা ব্যবহার করেন বলে।

বলা বাহুল্য অন্য সময় হলে এই উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের আধুনিকারাই সমাজের সমস্ত নারীর অনুকরণীয় হয়ে উঠতেন। রাজপরিবারের মেয়েরাও এইভাবে সাজসজ্জা করতেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতি আগ্রহ বোধ করত। বহুদিন পর্যন্ত। যদিও মেয়েদের পোশাকের 'ফ্যাশান' যতই থাকুক, কাটছাঁট খুব ভাল হত না, রবীন্দ্রনাথের মতে, দরজিরা খেলো লেস, নেটের টুকরো প্রভৃতি দিয়ে জামা তৈরি করত এবং ফ্যাশান বলেই সেগুলো চলত। এর ঠিক আগে ছিল সাদাসিধে জামা, মাপ না থাকায় সেগুলিও জিনিসপত্রের ঢাকনির মতো দেখাত। এ সময়কার পোশাকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

বস্তু হল ব্লাউজ, জ্যাকেট প্রভৃতি পোশাক। শাড়ি ভারতীয়দের জীবনে ছিল, এমনকি কাঁচুলি বস্তুটিও ছিল, যা একই সঙ্গে ব্লাউজ ও ব্রেসিয়ারের কাজ করত। বাংলায় যখন কাঁচুলি পরার চল্ ছিল তখন তাতে সূক্ষ্ম সুতোর কাজ করা হত—

'কিবা শোভা তার কাঁচলি করিল অনুপান।
দু'সারি কদম্বগাছ ফুলের বাগান॥···'

এসব পংক্তি থেকে কাজ করা কাঁচুলির কথা জানতে পারি। রাজস্থানে, বিশেষ করে গুজরাটের কচ্ছে এখনও কাজ করা কাঁচুলির ব্যবহার দেখা যায়। পরে, কাঁচুলির বদলে এসেছে কুর্তা—রাজস্থানে এই কুর্তা জ্যাকেটের সমতুল্য, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা নয়, কোমর পর্যন্ত ঝুল, তাতে থাকে সুতো, জরি, সলমা, চুমকির কাজ এবং এছাড়া তাতে বসানো হয় ছোট্ট ছোট্ট আয়নার মতো কাচ। বাঙালী মেয়েরা পারসী মেয়েদের মতো ব্লাউজ-জ্যাকেট ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। সাধারণত কয়েকটি ডিজাইন বা কাট্ এ সময় চোখে পড়ে—

১) ফুলহাতা ব্লাউজ, গলা ছোট এবং গোল। অনেক সময় হাতে-গলায় পাড় বসানো কিংবা রঙিন ফার ও নেট।

২) থ্রি-কোয়ার্টার হাতা, ঝালর বা লেস বসানো, গোল গলা কিংবা গলাবন্ধ কলারওয়ালা জ্যাকেট।

৩) ব্লাউজের হাত কনুইয়ের ওপরে, লেস বা ঝালর বা জরির পাড়।

৪) স্লিভলেস ব্লাউজ, লেস বসানো এবং লেস ছাড়া দুইই ছিল।

৫) ছোট হাতা, কিছুটা ফোলানো বা ঘটি হাতা ব্লাউজ। ইত্যাদি।

একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে আজকের দিনেও এই নিয়মই চলছে, তবে পরিশীলিত ভাবে। হাতে না হোক এখনকার ব্লাউজের গলা হয় নানারকম, চৌকো, বোটসেপ, ছ'কোনা, ইউসেপ, এয়ার

হোস্টেস, শক্ত কলার ইত্যাদি। মাঝখানে হাতে-গলায় সরু বর্ডার বা পাইপিন খুব দেখা যেত। কনট্রাস্ট কালারের পাইপিন এখনও আছে। আগেকার দিনের কোট, সোয়েটার কি শার্টের কলারের মতো কলার দেওয়া ব্লাউজ এখন আর কেউ পরে না, যেমন দুর্লভ হয়ে উঠেছে পুরো হাতা ব্লাউজ। কম-বেশি ভারতের সর্বত্রই এই ব্লাউজের ব্যবহার হয়, রাজস্থান-গুজরাটে কুর্তা-কাঁচুলি এখনও আছে এবং তা শাড়ি ও ঘাগরার সঙ্গে পরা হয়, অন্যত্র শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ অপরিহার্য। এক সময়, মেয়েদের হাতাহীন বা স্লিভলেস ব্লাউজ পরাকে সাধারণ মানুষ ঈষৎ নিন্দার চোখে দেখতেন, ঐ ব্লাউজ পরতেন শুধু ধনী ঘরের অভিজাত এবং উগ্রাধুনিকা কন্যারা। কেউ কেউ তাঁদের এই প্রবণতার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন আর্য-নারীদের প্রভাব, যাঁরা ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখতেন। এখন সকলেই এ ব্যাপারে উদার হয়েছেন।

ভারতে এখন মহিলাদের পোশাক হিসেবে শাড়ি প্রধান। ভাবাই যায় না, কয়েক শো বছর আগে শাড়ির অস্তিত্ব ছিল না? সে নিয়ে এখনও লোকের মনে সংশয় রয়েছে। শাড়ি পরা হয় প্রাদেশিক রুচি ও রীতি অনুযায়ী। বাঙালীরা পরেন আটপৌরে ধরনে, বাঁ কাঁধে আলগা আঁচল ফেলে, সাঁওতাল-কন্যারা এই আঁচলটি জড়িয়ে নেয় কোমরে আঁটসাঁট করে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি স্থানের মেয়েরা শাড়ি পরেন ডানদিকে সামনে আঁচল ছড়িয়ে, এর নাম গুজরাটীতে সিধাপাল্লা, কম-বেশি একরকম হলেও এই ধরনের শাড়ির আঁচলের উদ্বৃত্ত অংশ পিঠের দিকে কোথাও কম, কোথাও বেশি ছড়িয়ে থাকে। এখানে শাড়ির সঙ্গে ওড়নার সাদৃশ্য বেশি। দক্ষিণ ভারতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাছা দিয়ে

শাড়ি পরা হয়, তামিলনাড়ুতে এই ধরনের শাড়ি পরাব নাম নডিসারু। মহারাষ্ট্রীয়ানরা সকলেই কাছা দিয়ে শাড়ি পরেন, এঁদের শাড়ির নিচের অংশে থাকে কাছা এবং ওপরে আঁচল। আমরা যাকে মাদ্রাজী ধরনের শাড়ি পরা বলি, সেই আঁচল। উড়িষ্যার মেয়েরা শাড়ি পরেন নিচের দিকটা বাঙালী আটপৌরে ধরনে, ওপরে আঁচল নেন মাদ্রাজী ধরনে। অন্ধ্রের মেয়েদের শাড়ির নিচের দিকে সামনে কোঁচা থাকে আবার পেছনে কাছা ; উপরন্তু মাদ্রাজী ধরনের আঁচল। এঁদের শাড়ির মাপও অনেক বড়, আঠেরো হাতের কম নয়। তামিল ব্রাহ্মণ আয়ার ও আয়েঙ্গার মহিলাদের শাড়ি পরায় বিস্তর ফারাক — আয়েঙ্গার শাড়িতে এমনভাবে কাছা দেওয়া হবে যে দেখে মনে হয় পাজামার ওপর শাড়ি জড়ানো হল। আয়ারদের ডান পায়ে কাপড় জড়ানো থাকে, বাঁ পায়ে কোঁচার মতো ভাঁজ চোখে পড়ে। আয়ার-শাড়ির আঁচল ডানদিক দিয়ে ঝোলানো, তা বলে সিধাপাল্লার মতো নয়, মাদ্রাজী ধরনে টেনে এনে সেটা জড়ানো হয় গাছকোমর ধরনে। আয়েঙ্গার-শাড়ির আঁচল বাঁ দিকে এক প্যাঁচ মাদ্রাজী ধরনে ঘুরে এসে বাঙালী আটপৌরে ধরনে আলগা ভাবে বাঁ কাঁধে পড়েছে। কেরলের নাম্বুদ্রি, মেনন ও নায়াররাও কাছা দেন, তবে বাইরে থেকে দেখা যায় না। তাঁরা প্রথমে হাত-পাঁচেক লম্বা দু-হাত লম্বা কাপড় কৌপীনের মতো পরে তার ওপর পাঁচ-ছয় হাত লম্বা শাড়ি লুঙ্গির মতো করে পরেন। কুর্গের মেয়েদের শাড়ি পরার ধরনও কতকটা লুঙ্গির মতোই, এঁরা আঁচলটা কাঁধে তোলেন না, দু বাহুর নিচে দিয়ে বুক বেষ্টন করে কোমরে জড়িয়ে নেন, বলা বাহুল্য ঘোমটা দেন না। আসামের রিয়া-মেখলাও ছোট শাড়ি ও চাদর ছাড়া কিছু নয়, এসব অঞ্চলে বর্মি প্রভাবে লুঙি ধরনের কাপড় পরার চল্ বেশি।

এ প্রসঙ্গে ঘোমটার কথাটা বলে নিই। ভারতীয় সাজের গোড়া থেকেই অবগুণ্ঠন একটা বড় ভূমিকা পালন করে এসেছে। তামিল, বাঙালী ও ওড়িয়া মহিলারা বহুদিন সেলাই করা কাপড় পরতেন না তাই উত্তরপ্রদেশ, বিহার অঞ্চলে যখন কামিজ, কুর্তা, কাঁচুলি প্রভৃতির চল্ ছিল তখনও এঁরা তার পরিবর্তে ব্যবহার করতেন চাদর। উত্তর ভারতে কেউ চাদরের, কেউ ওড়নার, কেউ আঁচলের ঘোমটা টানতেন। দক্ষিণে সে বালাই ছিল না। তাঁরা সবাই মাথায় দিতেন ফুল এবং পথ চলতেন একটি ছাতা মাথায় দিয়ে। বাইরে বেরোবার সময় বাঙালী মেয়েরা পড়লেন মুশকিলে, কারণ যে-পারসীদের মতো শাড়ি পরার ধরন তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ঘোমটা দিতেন না। বস্তুত পারসীদের পোশাকে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, তাঁরা গুজরাটী ধরনে শাড়ি পরতেন, শুধু সিধা পাল্লার মত আঁচলটি সামনে না ছড়িয়ে ডান কাঁধে ফেলতেন মাদ্রাজী ধরনে। পারসীরা যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁরা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে নিশ্চয় এসেছিলেন কিন্তু এদেশে আশ্রয় নেবার সময় তাঁদের গ্রহণ করতে হয়েছিল দুটি শর্ত—এদেশের পোশাক তাঁরা পরবেন এবং এদেশের ভাষায় তাঁরা কথা কইবেন। গুজরাটরাজের এ শর্ত পারসীরা সুষ্ঠুভাবে পালন করেন।

যাইহোক, এখনকার মেয়েরা যেভাবে শাড়ির আঁচলটি মাথায় দিয়ে ছোট্ট ও মনোরম ঘোমটা তৈরি করে ফেলেন, সেটির প্রবর্তক জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা ইন্দিরা দেবী। তার আগে, গাউনের সঙ্গে ওড়না জোড়া দেওয়া ছাড়াও মেয়েরা শুরু করেছিলেন টুপি পরতে। মুঘল হারেমে ও দেশীয় রাজাদের হারেমে টুপির চল্ তো ছিলই ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও টুপি পরতেন, আমরা সুষমা দেবীকে টুপি

পরে আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে যেতে দেখেছি। সুনীতি দেবী স্পেনের মনট্রিলা জাতীয় ছোট টুপির সঙ্গে জুড়ে দিতেন একটা তিনকোনা পাতলা রুমালের মতো কাপড়, সেটা লেজের মতো ঝুলত টুপির পেছনে। এখন সবই গেছে।

এবার আসা যাক শাড়ি ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় পোশাকের কথায়। রাজস্থান ছাড়াও পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মেয়েদের পোশাক ছিল সেলাই করা অর্থাৎ শাড়ি নয়। জম্মু-কাশ্মীরের মেয়েরা নিম্নাঙ্গে পরে সালোয়ার ও পায়জামা। এক সময় সেখানে সুতন-ও পরা চলত, এখন তার চল্ প্রায় নেই। উর্ধ্বাঙ্গে পরে কামিজ ও কুর্তা। এছাড়া ফেরন নামে একটি ঢিলে জামাও আছে। শীতের দেশ বলে মাথা ঢাকবার জন্যে আছে 'কালপুশ' বা লাল টুপি, সঙ্গে জুজ, পুছ, তরঙ্গা প্রভৃতি আচ্ছাদন ব্যবহার করা যায়।

পাঞ্জাব-হরিয়ানার পোশাক সালোয়ার-কামিজ ও দোপাট্টা—এটি এখন সর্বভারতীয় পোশাকের মর্যাদা লাভ করেছে, অল্পবয়সী সব মেয়েই এ জাতীয় পোশাক পছন্দ করে। পোশাকটির সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও স্মার্টনেশ জনপ্রিয়তার মূল কারণ। উত্তরপ্রদেশের মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের মেয়েদের সাজ ছিল একটু অন্যরকমের। তারা রাজস্থানী ঘাগরা ও ইরানী পাজামার মিশ্রণে তৈরি করেছিল গরারা—তাতে থাকত প্রচুর কুঁচি—এক-একটা তৈরি করতে ছত্রিশ থেকে চল্লিশ গজ কাপড় লাগত। পরে এর ঘের কমতে কমতে ছয় গজে এসে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের মেয়েরা পরতেন অপেক্ষাকৃত আঁটসাঁট পাঞ্জাবি। পরে এঁরা পুরুষের মতো চুড়িদারের সঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা ঢিলে কামিজ ব্যবহার করতেন, সঙ্গে ওড়না বা দোপাট্টা

থাকত। এ পোশাকটিও এখন বেশ জনপ্রিয়। গুণও আছে—কটিদেশের অপেক্ষাকৃত স্থূলতা দৃষ্টিগ্রাহ্য থাকে না। এখনকার মেয়েরা এই পোশাকের সঙ্গে ওড়না নেয় না, বছরখানেক হল একটুকরো কাপড় কাঁধে সেলাই করে একপাশে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে চাদর বা ওড়নার মতো করে। কামিজ বা পাঞ্জাবি প্রথমে ছিল পুরো হাতা, মণিবন্ধে বোতাম দেওয়া। এখন ব্লাউজের মতোই কনুই পর্যন্ত হাতার ঝুল। বোতাম সামনে বা পেছনে বা কাঁধে। সামনে যাদের বোতাম বুকের কাছে তাদের সুতোর কাজ করার অবকাশ রয়েছে, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌ চিকনের কাজ এতে সুন্দর মানায়।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি অর্থাৎ উনিশ শতকীয় নারীদের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে। আগেই বলেছি, উচ্চবিত্ত এবং শাসক সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে সাধারণ মানুষ। বিশ শতকে এসে কিন্তু নারীরা শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের অনুকরণ করলেন না। এখন তাঁদের সামনে তিনটি আদর্শ—১) বিগত দিনের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর। চোখ ধাঁধানো দামী শাড়ি ও অজস্র গয়না। ২) উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের নারীদের পশ্চিম-ঘেঁষা সাজ। সিল্কের জরি পাড় শাড়ি, হাতাহীন ব্লাউজ, নির্বাচিত মূল্যবান অলঙ্কার, হাই-হিল জুতো, নানারকম খোঁপা, সুরুচিসম্মত প্রসাধন। ৩) শিক্ষিতা নারীদের যথাসম্ভব সাদাসিধে সাজ ও ব্যক্তিত্ব। এঁরা শাড়ি পরতেন সাদা এবং মোটা কাপড়ের, পরে পরতেন খদ্দর। সঙ্গে ব্লাউজ, শেমিজ, পেটিকোট কিন্তু লেস জরির বাহুল্য বর্জন করে। প্রসাধনকে এঁরা পুরোপুরি বর্জন করেছিলেন, অলঙ্কারকেও যথাসম্ভব। সাধারণ এবং রক্ষণশীল মানুষেরা এঁদের পছন্দ করতেন বেশি এবং একসময় সাহিত্যে নানাভাবে এঁদের উচ্চ প্রশংসা করা হত। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য ও কেতকীকে

মনে পড়লেই বোঝা যায় লাবণ্য তৃতীয় ও কেতকী বা কেটী দ্বিতীয় শ্রেণীর সমাজের প্রতিনিধি। প্রথম শ্রেণীর আদর্শটিও যে পরিত্যক্ত হল তা নয়। সুবর্ণবণিক সমাজ এবং বহু সাবেকী পরিবার কিছুটা অদলবদল করে প্রথমটিকে গ্রহণ করলেন। আধুনিকা ও শিক্ষিতারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন বইকি! বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন আক্রমণ করলেন আয়তি চিহ্নগুলিকে।

এক-এক রাজ্যে বা এক-এক সমাজে আয়তির চিহ্ন এক-এক রকম। হিন্দু মেয়েদের অধিকাংশই সিঁদুর পরে। এছাড়া বাঙালীরা পরে লোহা বা সোনা-বাঁধানো নোয়া, তামিল মেয়েদের বিয়ের সময় বর কোথাও আংটি, কোথাও বা মল পরিয়ে দেয়, সেটাই তাদের আয়তির চিহ্ন। এছাড়া কোথাও আয়তিদের পরতে হয় দু' নাকে নাকছাবি, কোথাও বা এক নাকে। মারাঠী মেয়েরা পরেন মঙ্গলসূত্র, কালো পুঁতির মন্ত্রপূত মালা সোনায় গেঁথে তৈরি হয় মঙ্গলসূত্র, রাজস্থানের মেয়েরা কপালে পরেন চ্যাপটা লাট্টুর মতো টিকলি। এছাড়া কোথাও নথ, কোথাও নোলক, কোথাও চুড়ি, কোথাও কানের ওপরে পরা মাকড়ি সধবার চিহ্ন। অনেকেই একে নারীর সৌভাগ্যচিহ্ন মনে করেন, কারণ বিধবা ও কুমারীর এই সৌভাগ্যচিহ্ন ধারণের অধিকার নেই। বেগম রোকেয়ার মতে, এগুলি আসলে অলঙ্কার নয়—অতীতের বন্দীদশার চিহ্ন, বিশেষ করে সৌভাগ্যচিহ্নরূপে ধারণীয় অলঙ্কারগুলি তো নিশ্চয়ই—

'কারাগাবের বন্দিগণ পায়ে লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমাদের স্বর্ণ-রৌপ্যের বেড়ী, অর্থাৎ মল পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহনির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত চুড়ি। বলা বাহুল্য লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না। কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ দেখি

উহারই অনুকরণে বোধহয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি, 'হার পরিয়াছি'। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকাদড়ি' পরায়। এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে নোলক পরাইয়াছেন। ঐ নোলক হইতেছে স্বামীর অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন !'

বেগম রোকেয়ার মতো বিরাগের দৃষ্টিতে না হলেও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে প্রথম পাওয়া উপহারটি (হাতে পরবার শিকল) সম্বন্ধে একই মন্তব্য করেছেন সরসভাবে। যুগরুচি পরিবর্তনের ফলে কলসীর কানার মতো বাউটি, গলায় একঝুড়ি সুতোয় গাঁথা সোনার ঢিল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, লম্বা-চওড়া পদার্থ দিয়ে তৈরি করা অলঙ্কার এবং দামী ও ভারী শাড়ি গুলবাহার, বেনারসী, পঞ্চমপেড়ে, বালুচরী পরাও ক্রমে কমে গেল।

প্রাত্যহিক কর্মক্ষেত্রে বেরিয়েই মেয়েরা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন গয়না স্ত্রীধন হলেও তা সব সময় ব্যবহার করা চলে কোন কাজ না করে বাড়িতে বসে থাকলে তবেই। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে নারীরা খদ্দর পরলেন, কাচের চুড়ি, বিলিতি শাড়ি, প্রসাধন সবই ত্যাগ করলেন, সবাই নয় অনেকে। তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে তৃতীয় পর্যায়ের সাজের ধারাটি বজায় রইল, তবে একভাবে নয়। কিছু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে আনলেন সরলা দেবী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নানারকম সাজসজ্জার প্রচলন ছিল। সাবেকী ধারাটি বর্জন করে জ্ঞানদানন্দিনী নতুন রীতি এনেছিলেন। তবে সাবেকী সাজেও সৌন্দর্য বজায় রাখতে জানতেন এ বাড়ির মেয়েরা। পাঁচ নং বাড়ির মেয়েদের একজন, রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ

প্রতিমা লিখেছেন, 'প্রতি উৎসবেই মেয়েদের তখন বিশেষ সাজ ছিল। বাসন্তী রঙে ছোপানো কালোপেড়ে শাড়ি, মাথায় ফুলের মালা, কপালে খয়েরের টিপ—এই ছিল বসন্ত পঞ্চমীর সাজ। দুর্গোৎসবে ছিল রঙ-বেরঙের উজ্জ্বল শাড়ি, ফুলের গয়না, চন্দন ও ফুলের প্রসাধন। দোল পূর্ণিমারও একটি বিশেষ সাজ ছিল, সে হল হালকা মসলিনের শাড়ি, ফুলের গয়না আর আতর গোলাপের গন্ধমাখা মালা। দোলের দিন সাদা মসলিন পরার উদ্দেশ্য ছিল যে আবিরের লাল রঙ সাদা ফুরফুরে শাড়িতে রঙিন বুটি ছড়িয়ে দেবে।' এঁরা দিনের বেলা সোনার গয়না, রাতে হীরে-জহরতের জড়োয়া গয়না ও বিকেলে মুক্তোর গয়না পরতেন। এই শিল্পরুচি সবার ছিল না, তবু উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের গোড়ায় শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারগুলিতে যে শিল্পসম্মত আবরণ-আভরণের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল এটি তারই উদাহরণ। এ সময় মেয়েরা বহু পুরনো ও নতুন ছাঁদে খোঁপা বাঁধতেন। 'বেনেবাগান', 'মন ভোলানো', 'ফাঁশ জাল', 'কলকা', 'বিবিয়ানা' প্রভৃতি ছাঁদের সঙ্গে সঙ্গে উঠল বি. এ পাশ খোঁপা, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ খোঁপা, ফুল অ্যালবার্ট খোঁপা, ফিরিঙ্গি খোঁপা, বেনে খোঁপা ইত্যাদি। যাইহোক, ব্রাহ্মিকারা যা বর্জন করেছিলেন দেশীয় সংস্কৃতি বলে, আবার তাকেই ফিরিয়ে আনলেন সরলা দেবী, কপালে টিপ পরা, পায়ে আলতা পরা সবই। প্রাক-স্বাধীনতা পর্যন্ত এভাবেই আমাদের সাজসজ্জার পালাবদল ঘটেছে বারবার।

নারীসমাজে জুতো পরার অভ্যাস ছিল না, যদিও মধ্যযুগের মদনিকাকে আমরা হিল-তোলা হাওয়াই চটির মতো জুতো পরতে দেখেছি। কিন্তু আধুনিকতা আসার আগে মেয়েরা মোটেই জুতো

পরতেন না। এমনকি বেথুন কলেজে যাঁরা পড়তে যেতেন তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই জুতো পরতেন না। অথচ মুঘলযুগেও সব নারীকেই আমরা মখমল ও জরির পাদুকা ব্যবহার করতে দেখেছি, সেই জুতো এখনও লক্ষ্ণৌ-রাজস্থানে ছড়িয়ে আছে। বাঙালী মেয়েদের পায়ে জুতো দেখে একসময় অনেকেই সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর স্ত্রী ইন্দিরা যখন বধূ হয়ে গ্রামে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন পালকি করে, তখন উৎসুক বালক-বালিকারা ছুটে এল তাঁকে দেখতে। ইন্দিরা লিখেছেন, 'আমার পরনে লাল কাপড় দেখিয়া বলিল—এই কনে যাইছেছে। আর একজন আমার পায়ে জুতা দেখিয়া বলিল—ওরে কনে নয় রে, দেখছিস না পায়ে জুতো আছে, ও বর।' জুতো পরা মেয়ে তাদের কখনও চোখে পড়েনি। ব্রাহ্মিকারা প্রথম যখন নিয়ম ভাঙবার জন্যে কুলবধূর পর্দা অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্য পথে বেরিয়েছিলেন গাউন ও জুতো পরে, তখন অনভ্যস্ত বলে কেউ-কেউ জুতোটা দড়ি দিয়ে পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলেন। পরে মেয়েরা অভ্যস্ত হলেন। বিলিতি হিল-তোলা জুতোর সঙ্গে চটি বা চপ্পল শাড়িধারিণীদের বেশি পছন্দ হল। ইংলিশ-হিলের চেয়ে চীনা-হিল ভারতীয় নারীর পক্ষে বেশি উপযোগী মনে হলেও দুটোই আছে আজও, সেইসঙ্গে ফ্ল্যাট-চটি। গরম আবহাওয়ায় পুরো পা ঢাকা জুতো বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি, শুধু টিকে আছে।

ভারত স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশের অর্থনীতি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে আমাদের সাজপোশাকের ক্ষেত্রে। অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির জন্যে জরির কাজ যেমন বন্ধ হল তেমনি বন্ধ হল শিল্পীদের

কাজ। এ অবশ্য নতুন নয়। শাসক ইংরেজ বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায় লাভবান হবার জন্যে দেশীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করেছিল। হারিয়ে গেল বহুদিনের অসাধারণ দক্ষতা ও হাতের কাজ। ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক ধারাকে বজায় রাখা হত। নিজস্ব ঘরানার কৌশল কেউ অপরকে শেখাতেন না। ফলে বহু কৌশল শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের মতো হারিয়ে গেল। বালুচর গ্রামে আর একটিও বালুচরী বয়নকারী তাঁতশিল্পী নেই। সমগ্র গুজরাটে পাটোলা শাড়ি বোনে একটিমাত্র সালভে পরিবার। অবধ জামদানীর কলা-কৌশল লুপ্তপ্রায়। মসলিন, বারকাঠিমের শাড়ি, কলাবতী শাড়ি এখন কিংবদন্তী। এভাবেই বহু শাড়ির বয়ন-কৌশল একেবারে হারিয়ে যায়। এবং স্বাধীন ভারতে বয়ন সংস্থার চেষ্টায় পুরনো ধারাগুলির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে ১৯৬০ সাল নাগাদ।

ভারত স্বাধীন হবার পরেও বিদেশী পোশাকের ওপর আমাদের আগ্রহ ক্রমশই বাড়ছে। পুরুষের পোশাকের ক্ষেত্রে প্যাণ্ট-শার্ট-কোট এখন সর্বভারতীয় পোশাক। দেশীয় ধুতি প্রায় নির্বাসিত বা বৃদ্ধ ও গ্রাম্য পুরুষদের পোশাকে পর্যবসিত। ভারতীয় নারীরা কিন্তু এত সহজে বিদেশী পোশাককে গ্রহণ করেননি। তাঁদের অসামান্য সৌন্দর্যবোধ ও চিরাচরিত ধারার প্রবহমানতা বুঝিয়ে দিয়েছে পশ্চিমের পুরোপুরি অনুকরণ তাঁদের মানায় না। কথাটা হয়ত আধুনিক জিন্‌সের যুগে অচল। এখনকার তরুণ-তরুণীরা জিন্‌সের ভক্ত—একই ধরনের পোশাক অনেকে পরে। তার সঙ্গে গেঞ্জি। জিন্‌সের নীল রঙ জায়গায় জায়গায় সাদা হয়ে গেছে। সেটাই ফ্যাশান। শোনা গেছে, প্যাণ্ট তৈরি করার সময় টেলরকে (এদের দরজি বলা চলবে না) নির্দেশ দেওয়া হয় প্যাণ্টটি যেন বহু-ব্যবহৃত

দেখায়। এই জিন্‌সের আগে বেলবটস্‌ও মাত্রাতিরিক্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এখন চোখে পড়ে না। কিন্তু রিয়া-মেখলা, ঘাগরা-কুর্তা, সালোয়ার-কামিজ কোনটাই একেবারে যায়নি। শাড়ি তো আছেই। এর কারণ কি ?

কাবণ ভারতীয় মেয়েদের জানা আছে কী তাঁদের মানায় আর কী মানায় না। ইউবোপীয় পোশাক বিশ্বের সব দেশেই জনপ্রিয়, এশিয়ার বহু দেশ, চীন-জাপান প্রমুখ সকলেই বিদেশী পোশাককে আপন কবে নিয়েছেন। বিদেশী স্কার্ট, ফ্রক, ব্লাউজ, গাউন সেখানকার নারীরা সাদরে গ্রহণ করেছেন। এই পোশাক ব্যবহাব করা সহজ, চটপট কাজ করা যায়, এবং দেখায়ও স্মার্ট। হাই-হিল পরে চললেই একটি মেয়ের হাঁটার ধরন নিমেষে বদলে যায়। ঢিলেঢালা ভাবের বদলে আসে সতেজ ঝলমলে ভাব। কেশ পরিচর্যার হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায় ছোট ছোট করে চুল ছাঁটলে। এটা গরমের দেশে আরামদায়কও। তবু ভারতের পূর্ণবয়স্কা নারীরা গাউন পরার কথা ভাবেন না, ফ্রক সীমাবদ্ধ আছে কিশোরীদের মধ্যে। মিনি-মিডি-ম্যাক্সিও তাই। ভারতীয় নারীর অবয়ব পশ্চিমের মেয়েদের মতো সোজা ও সমান নয়, তাঁদের শরীরের মনোরম বাঁকে আছে ঢেউ। এই ঢেউ বিদেশী পোশাকে বেমানান, বিসদৃশ, কখনও বা স্থূলভাবে পীড়া দেয় রুচিকে। ঠিক একই কারণে শাড়ি পরলে মেমসাহেবদের মানায় না। ভারতের মেয়েরা তাঁদের রূপের এই বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিয়েছেন বলেই নতুনের মধ্যেও শাশ্বত ফিরে এসেছে বারবার। এর কোন বিকল্প নেই। সাজসজ্জার জগতে পুরনো ফ্যাশান বারবার ফিরে আসে, বিদেশের মতো এবেলা এসে ওবেলা চলে যাবার ফ্যাশান আমাদের দেশে চলে না। সীমাস্বর্গের

ইন্দ্রাণী হয়ে যে কল্যাণী মর্ত্যে স্বর্গ রচনা করে তার দু' হাতে নিরেট রোদ বাঁধা পড়ে এখনও। এখনকার রূপসীরাও একথা ক্রমে বুঝতে পারছেন বলে মার্কিন দেশের 'পাঙ্ক'দের অনুকরণ না করে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের খোঁজ করছেন। আসলে শাশ্বত ভারতেই সৌন্দর্য রহস্যের চাবিকাঠি লুকনো ছিল। ছিল মোহিনী আড়াল, ছিল লজ্জার মতো কমনীয় ভূষণ।

ঠিক এই মুহূর্তের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বলব—ভারতীয় নারীর সাজসজ্জায় একদিকে এসেছে স্বাভাবিকতা, অপরদিকে আছে ঐতিহ্য। প্রথমটি যুগোপযোগী। নারী আজ বহু ক্ষেত্রে পুরুষের সহকর্মী—একসঙ্গে কাজ করছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রসাধন করার সময় কই? সাদাসিধে পোশাক, সামান্য রুচির পরিচয় চুলের কাটিংয়ে, চোখের তারায়, বাহুল্য নেই। তার মূল্যও তো কম নয়। যে মেয়ে শাড়ি পরছে সেও একটা বেণী দুলিয়ে চলেছে কলেজে, কর্মস্থলে। কুঁচিয়ে পরা শাড়ি, আঁচলে পিন কিংবা পিঠ ঢাকা দিয়ে সামনে টানা, মুখে সামান্য প্রসাধন—আইলাইনারের স্পর্শ, লিপস্টিকের ছোঁয়া, ছোট্ট টিপ, নিটোল হাতে একটি বালা, একটি ঘড়ি—তাও মন্দ নয়।

অপরদিকে বাড়ছে সাবেকী জিনিসের চাহিদা। অভিজাত সমাজ চিরকালই অতীতকে ধরে রাখতে চান। প্রধানত তাঁদের উৎসাহেই আবার বোনা হয়েছে বালুচরী, পাটোলা, পানেতর, ঘরচোলা প্রভৃতি সাবেকী দামী বিয়ের সাজ। আধুনিক নকশা বেনারসী-বালুচরীতে চলে না, খোলেও না। তাতে প্রয়োজন সেই কলকা-বুটা কিংবা রাজা-বাদশা এবং সাহেবের তামাক খাওয়ার ছবি। উড়িষ্যার বহু লুপ্তপ্রায় আদিবাসীদের ব্যবহার্য শাড়ির নকশার এভাবেই

পুনরুজ্জীবন ঘটছে, এখন ভারতীয় শাড়ির গৌরব আগের মতোই ফিরে এসেছে। বেড়েছে এদের চাহিদা। আমাদের দেশে দামী কোটের চেয়ে জামেয়ার শালের আভিজাত্য অনেক বেশি। ভারতীয় নারীদের এই আগ্রহ না থাকলে অবশ্য প্রাচীন শিল্পের নবীকরণ সম্ভব হত না। পুরুষদের পোশাক মোটেই ফিরে আসেনি, নতুন হয়ে যা ফিরেছে তা শুধু মেয়েদেরই পোশাক, এমনকি ভারতীয় পুরুষের পোশাকও রূপ বদলে ফিরেছে, 'ধুতি সালোয়ার' ও কামিজ হয়ে। পাজামাকে এমন ছাঁটকাট দেওয়া হয়েছে যা মালকোঁচা মেরে ধুতি পরার স্মৃতি নিয়ে আসে, তার ওপর পিরান বা কুর্তার নকল করা পাঞ্জাবি এমনকি কাঁধের পাট করা চাদর পর্যন্ত। যারা সালোয়ার কামিজ পরে তারা খুশিমনেই এ পোশাক পরছে। একই সঙ্গে পরছে পশ্চিমের ব্যাগি, লুজার প্রভৃতি, যেটা যখনকার ফ্যাশান।

আধুনিক সাজসজ্জায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে গয়নার ক্ষেত্রে। এখনকার মেয়েরা দামী গয়না পরে না। সোনার গয়না পরে না নিরাপত্তার অভাবে। তার অভাব মিটিয়েছে ইমিটেশনের গয়না— ঝুটো পাথর, কমদামী ধাতু, কাচ, শাঁখ, পুঁতি—এসবের উপকরণ। পুরনো দিনের অনেক অলঙ্কারের নকল ও বিশেষ করে আদিবাসীদের কিছু কিছু গয়না জনপ্রিয় হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে স্টীলের গয়না, ব্রেসলেট ও রিস্টলেটের অনুকরণ।

প্রসাধনের জগতে অজস্র উপাদান ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সব দেশেই। চলেছে প্রসাধন-প্রস্তুতির আয়োজন। সবই কৃত্রিম এবং ক্রয়যোগ্য—স্নো, ক্রীম, পাউডার ছিল এককালে প্রসাধনের উপকরণ। এখন ময়শ্চারাইজার, ফাউণ্ডেশন ক্রীম, কনডিশনার, মেকআপ, ফেসপ্যাক, মাসকারা, আইশ্যাডো, আইলাইনার, লিপস্টিক, লিপগ্লস,

রুজ, গ্লিমার প্রভৃতি অজস্র নামের চোখ-ধাঁধানো রূপ ভারতীয় নারীর সাজে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি ; কর্মব্যস্ততা যে তাঁদের প্রসাধন-বিমুখ করেনি তার প্রমাণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেওয়া বিউটি টিপস ও প্রসাধনের অজস্র নতুন বিজ্ঞাপন। এই প্রসাধনের সংমিশ্রণে যা গড়ে ওঠে তার সঙ্গে কাংড়ার সুন্দরীর সাজের তফাত পাওয়া যায় না। মনে পড়ে ডিয়র সাহেবের কথা, যে সৌন্দর্য থাকা উচিত—তারই আভাস দেয় এরা। এখনকার ম্যাচিং পদ্ধতি হল প্রসাধনকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক স্তরে নিয়ে যাওয়া। তাই গায়ের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ফাউণ্ডেশন ক্রীম, পাউডার, লিপস্টিক, আইশ্যাডো সবই মেলে। আরেকরকম ম্যাচিং আছে, পোশাকের সঙ্গে প্রসাধনের। ইংরেজ মেয়েরা জুতোর সঙ্গে ব্যাগ ম্যাচ করে নেবেনই! ভারতীয়রা পোশাক ছাড়াও গয়নার সঙ্গে প্রসাধনের রঙের সাদৃশ্য ঘটান। এক রঙের পোশাক এখন অনেকেই পরে। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ, পেটিকোটের রঙ অবশ্যই মেলাতে হবে ; উনিশ-বিশ হলে সব মাটি। তখন খুঁজতে হবে কনট্রাস্ট, তাতে ভারতীয়রা সিদ্ধহস্ত, তবে তারও নিয়ম আছে। সবুজ শাড়ির সঙ্গে আগে লাল ও হলুদ ম্যাচ করত। এখন হলুদ চলে, লাল চলে না। লাল শাড়ির সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ কোনদিনই চলে না। এখন চেষ্টা চলছে দুটো চড়া রঙের কম্বিনেশন দিয়ে সমস্ত রঙটা বদলে দেওয়া, যেমন কমলা কামিজে কচি কলাপাতা বর্ডার, কিংবা হলদের সঙ্গে বেগনে, গাঢ় নীলের সঙ্গে আকাশ নীল। এখনকার নামীদামী মিলগুলিও কালার ম্যাচিং ও কম্বিনেশন কালার তৈরি করছে, তাতে মেয়েদের পরিশ্রম কমে। না খুঁজতেই হাতের কাছে মেলে ম্যাচ করা শাড়ি-ব্লাউজ বা প্রিণ্ট, চুড়িদার-কামিজ-ওড়না,

স্কার্ট-ব্লাউজ। এর সঙ্গে মেয়েরা মেলায় লিপস্টিক, টিপ, নেলপালিশের রঙ, বিশেষ করে তুল ও আংটির পাথর, জুতো ও ব্যাগ। যখন মাথায় রিবন বাঁধার চল্ ছিল তখন বাঁধত সেই এক রঙের রিবন। সবই খুব কম এবং শিল্পসম্মত ভাবে। দুটো-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—কানে ভারী গয়না থাকলে গলায় সরু চেন, গলায় ও হাতে বেশি অলঙ্কার থাকলে কানে শুধু টপ। কোনটাই বাহুল্য নয়, যেন কেউ না বলতে পারে, 'মেয়েটা কি সেজেছে', তাহলেই সব মাটি।

আধুনিক যুগে দেখা হয়, সাজসজ্জা পুরোপুরি ঠিক হয়েছে কিনা এবং এজন্য নারীদের অন্তর্বাস সম্বন্ধে এসেছে সচেতনতা। ভারতে বহুদিন আগে থেকেই স্তনবাস বা স্তনপট্টের ব্যবহার ছিল, ছিল কাঁচুলি, যা নারীর বক্ষ-সৌন্দর্যকে রক্ষা করত। বিদেশ থেকে এসেছে বিভিন্ন ধরনের ব্রেসিয়ার, আজকের নারীর পোশাকে যা প্রায় অপরিহার্য। 'প্রায়' বললাম এইজন্য যে, আধুনিক নারীমুক্তি আন্দোলনে বিদেশে এই 'ব্রা'কে আক্রমণ করা হয়েছে এবং বন্ধনের প্রতীক হিসেবে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। বিদেশিনীদের অনেকেই পোশাকের তালিকা থেকে 'ব্রা' বর্জন করেন। আমাদের দেশে এজাতীয় প্রবণতা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পোশাকের কোন যোগও নেই। ব্রা সৌন্দর্য রক্ষা করতেও সাহায্য করে থাকে।

আধুনিক বিউটি টিপ্‌সগুলি থেকে বোঝা যায়, তাৎক্ষণিক সৌন্দর্যসৃষ্টির বদলে সার্বিকভাবে সৌন্দর্যরক্ষার ওপর মেয়েরা বেশি জোর দিয়েছেন। তাই বদলেছে রূপচর্চার রীতিনীতি। আগেকার দিনে মেয়েদের সাজসজ্জার আদর্শ কীভাবে নির্ণীত হত ঠিক জানা নেই। ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রাচীন ভারতে দেবদাসীরা ছিলেন

সেই আদর্শ এবং অবশ্যই রানী ও রাজকন্যারা। মুঘলযুগে রাজা-বাদশাহের অন্তঃপুরের নকল করতেন আমীর-ওমরাহ-আমলা প্রমুখ অভিজাত সমাজ। আধুনিক যুগে সাজপোশাকের জগতে নতুনত্ব নিয়ে আসেন চিত্রজগতের রূপসীরা। তাঁদের শাড়ি পরার ধরন, ব্লাউজের কাট, চুলের স্টাইল নকল করেন মেয়েরা। এখন শাড়ির বদলে এসেছে অন্যান্য পোশাক, সবই চলচ্চিত্রের দৌলতে। প্যারিসের অভিজাত পোশাক-নির্মাতার সংস্থা থেকে রূপ বদলাতে বদলাতে চলে আসে মেটিয়াবুরুজের দরজির ঘরে। বোম্বাই-এ এই অনুকরণ আরো বেশি হয়। শিশু ও কিশোরীদের পোশাক থেকে শাড়ি বাদ গেছে বহুদিন, এখন বড়রাও বাদ দেবার কথা ভাবে। এই অনুকরণে বিপত্তি যে আসে না তা নয়, অন্ধ অনুকরণ সবসময়ই বিপজ্জনক। যে মুখে যে হেয়ার-সেটিং মানায় না, অনুকরণের ফলে তা সৌন্দর্য বাড়ায় না, বরং স্বাভাবিক শ্রীকে নষ্ট করে। সুখের বিষয়, বিউটিশিয়ানরা আজকাল নারীদের উপদেশ দিচ্ছেন, নিজের মুখের নিজস্ব সৌন্দর্যটি আগে খুঁজে বার করে নিয়ে তবে চুল কাটতে বা বিশেষভাবে সাজসজ্জা করতে।

রূপসজ্জা ও প্রসাধনে কিশোরীদের আগ্রহই সবচেয়ে বেশি এবং একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের বেশি সাজলে মানায় না। আজকাল কিশোরীদের সাজের মধ্যে চুলই প্রধান, সুন্দরভাবে কাট-ছাঁট করা চুল—সে ইউ সেফ, বয়েজ কাট, বব্ ছাঁট ছাড়াও অনেক রকম হয়—তার উপযুক্ত পরিচর্যা তাদের সুন্দর করে। অধিকাংশই চুল খুলে রাখে, চলচ্চিত্রেও তাই দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এসব প্রভাব বেশিদিন থাকে না, প্রায়ই বদলায়। বদলাক। সাজসজ্জা তো বদলাবেই। বদলাবে যুগের রুচি। তারই মধ্য দিয়ে ভারত-সুন্দরীরা

নিজেদের সুন্দরী করে তুলবেন। তাঁরা জানেন তাঁদের দেহের সৌন্দর্য কোথায়, আর চোখের আড়ালে রাখতে হবে কোন্ অংশকে। সাজসজ্জার সুচারু-শোভনতায় কেমন করে পেতে হবে শ্রদ্ধার আসন। কীভাবে আরোপিত হবে মনোরম ব্যক্তিত্ব, যা নারীকে যথার্থ মর্যাদা দেবে, ভোগেব আবর্তে পুতুলের মতো ভাসিয়ে দেবে না। এখন শুধ্ চেষ্টা—কী করে কত দ্রুত সম্ভব নিজেকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে তোলা যায়, এই সাজসজ্জা একান্ত ভাবে নিজের জন্যে, নিজের চেহারায় বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করবার জন্যে। প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জানতেন ভারতীয় নারীর এই শিল্পবোধ ও রুচিসম্মত আবরণ-আভরণ নির্বাচনেব কথা। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ শ্রীময়ী হয়ে উঠত উপযুক্ত পোশাক ও প্রসাধনে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও আন্তরিক উৎসাহে ভারতীয় পোশাক-প্রসাধন-শিল্পরুচির অনেকখানি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। দেশের উইভার সার্ভিস সেণ্টারগুলি পঞ্চাশের দশকের শেষে স্থাপিত হলেও তাঁতবস্ত্রকে সর্বসাধারণের প্রিয় ও উৎকৃষ্ট মানে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালেই। এখনকার আধুনিকারা উৎকৃষ্ট মানের তাঁতের শাড়ি পরে যে কোন সভা এমনকি বিয়ে-বাড়িতেও গিয়ে থাকেন। অথচ বছর কয়েক আগেও বিদেশী সিল্ক বা দামী জর্জেট ও কৃত্রিম তন্তুর শাড়ি সকলের মনোহরণ করেছিল। এখনও যে কৃত্রিম তন্তুর আদর নেই তা নয়, ব্যবহার করা সহজ ও অপেক্ষাকৃত কম দাম বলে দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে যাবার সময় ভারতীয় মেয়েরা এসব শাড়ি ব্যবহার করেন ঠিকই, যেমন পরেন ছাপা বা প্রিণ্টেড শাড়ি কিন্তু অভিজাত শাড়ি হিসেবে গণ্য করেন সিল্ক, জরি ও দামী সুতির শাড়িকেই। এর ফলে অনেক

লুপ্তপ্রায় বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার ঘটছে এবং সাদরে অনেক বেশি দাম দিয়ে ভারতের রুচিসম্পন্ন নারীরাই তা সংগ্রহ করছেন।

প্রসাধনের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন এসেছে। ভারতের সব নারীই অল্পবিস্তর ঝুঁকেছেন আয়ুর্বেদিক বা ভেষজ থেকে প্রস্তুত করা প্রসাধন সামগ্রীর দিকে। এগুলির দামও অপেক্ষাকৃত বেশি। আগেকার মতো খল-নুড়ি কিংবা শিল-নোড়াতে নিজেরা বেটে নিয়ে ব্যবহার করা অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব নয় বলে প্রসাধন-নির্মাতারাই এই কাজ করে দিচ্ছেন। নানারকম ক্রীমের বদলে হলুদ-তুলসী-চন্দন প্রভৃতির নির্যাস দিয়ে ক্রীম তৈরি করা হচ্ছে। বর্ণপ্রসাদকরূপে বেসন-সর-লেবু-শসা-মুলতানী মাটি সবই আবার ফিরে এসেছে ফেস প্যাক হয়ে। কেশ পরিচর্যায় রিঠে কিংবা মেহেদি কিংবা জৈতুন। বহু বিউটি পারলারে এখন রূপচর্চা ও দেহশ্রী বজায় রাখার ভেষজ-চিকিৎসা হচ্ছে। তার সঙ্গে যে আধুনিক পদ্ধতিগুলি বাতিল হয়ে গেছে তা নয়। তবু দেখা যাচ্ছে ভারতীয়রা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রসাধন পদ্ধতিতেই ছিল প্রকৃত সৌন্দর্য লাভের সহজাত গুণ। সারা বিশ্বই এখন ঝুঁকেছে ভারতীয় প্রসাধনকলার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে। একবার জয়সলমীরে এক মার্কিন যুবতীকে দেখেছিলাম, সে ফণিমনসা-জাতীয় গাছ থেকে সংগ্রহ করছিল পাতার মাঝখানকার ঘন সাদা ক্রীমের মতো জলীয় অংশ, সযত্নে জমিয়ে রাখছিল একটি শূন্য কাচের পাত্রে। জিগ্যেস করায় জানাল, এই ক্রীম সে মুখে মাখবে, বিশ্বের সবচেয়ে দামী ক্রীমের চেয়েও এই ক্রীম ভাল এবং বলা বাহুল্য তাদের দেশে দুর্লভ। তাই সে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে।

সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবে আরো কয়েকটি ব্যাপারের ওপর আধুনিকারা নজর দিচ্ছেন, যেমন ব্যায়াম ও সুষম খাদ্য—শারীরিক

সৌন্দর্যের প্রকৃত রহস্য স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তবেই বজায় থাকে, এই হচ্ছে এখনকার অভিমত। বলা বাহুল্য তাঁরা রূপচর্চার ক্ষেত্রে পশ্চিমের মতো দেহসৌষ্ঠবের পূজারী। প্রাচীন ভারতেও তাই ছিল, মুঘলযুগেও সুন্দরীরা সকলেই ছিলেন অপরূপ দেহলাবণ্যের অধিকারিণী। ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল আধুনিক যুগ আসার অব্যবহিত আগে। রূপচর্চার ক্ষেত্রে এই সময়টি উজ্জ্বল নয়। সবসময়ই তন্বীর জয়গান শোনা গিয়েছে, যদিও ভারতীয়ারা জানতেন অতিরিক্ত স্লিম ফিগারের অধিকারিণী দীর্ঘদিন যৌবনকে ধরে রাখতে পারেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দেহ অতিমাত্রায় কর্কশ হয়ে পড়ে, সেজন্যে ভারতীয়ারা ইউরোপীয়ান মেয়েদের মতো তন্বী হবার চেষ্টা করেনি। বস্তুত, আবরণে-আভরণে, সাজসজ্জা ও প্রসাধনে ভারতীয় নারী যে কোন নতুন ধারাকে মিশিয়ে দিতে পারে। বিদেশী যে কোন পোশাক-অলঙ্কার বা প্রসাধনের মূল বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে তাকে মিলিয়ে দেওয়া হয় সনাতন স্রোতের সঙ্গে। যে সাজ বা প্রসাধন এই ধারার সঙ্গে খাপ খায় না, সে পরিত্যক্ত হয়। যেটি খাপ খায় সেটি থেকে যায় ভারতের রূপসাধনার অঙ্গ হয়ে। অতি-আধুনিকাও বিয়ের দিন সাজতে চায় আগেকার দিনের মতো করে। তাতে থাকে বিদেশী প্রসাধন, বিদেশী অঙ্গরাগ, কিন্তু শাড়ি বা আনুষঙ্গিক বিবাহসজ্জাটি তৈরি হয় পুরনো আদলে। পুরনো সাজই নতুন জীবনে প্রবেশের দিন নতুন হয়ে ওঠে। আর এখানেই লুকিয়ে আছে ভারতীয় নারীর সাজসজ্জার শেষ কথা।